**Anandi Kalyan**

***A novel***

***by***

**Sri Basab**

**2·50**

# আনন্দী কল্যাণ

শ্রীবাসব

বিশ্ববাণী
১১/এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী
১১।এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট্
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গণেশ বসু

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
রয়্যাল হাফটোন



ছ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

আবর্জী-কল্যাণ

"The book of life begins with a man and woman in a garden and ends—with Revelations."

—*Oscar Wilde*
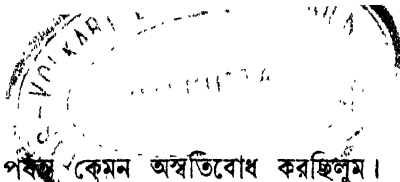
নইনিতালে এসে পর্যন্ত কেমন অস্বস্তিবোধ করছিলুম। একটা বাঙালীর মুখ দেখতে পাইনা। পাইনা বাঙলা কথা শুনতে। আমাদের হোটেলে তো নেই-ই। পথে ঘাটেও কি একটা বাঙালীর মুখ চোখে পড়ে না। কেমন অদ্ভুত মনে হয়। সারা ভারতের দেশ বিদেশের লোক যেখানে উপস্থিত সেখানে অনুপস্থিত শুধু বাঙালী। অথচ এটা পাহাড়ী মরশুম। এই মে-জুন। সর্বপ্রদেশের লোক এসেছে, আসেনি শুধু বাঙালী। আমাদের হোটেলে তো পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা সর্ব সম্প্রদায় থৈ থৈ করছে। নেই শুধু উৎকল আর বঙ্গ।

পথে বেরিয়ে জনজটলার মাঝে চেয়ে চেয়ে খুঁজি। কিন্তু একটা বাঙালীর মুখ পাই না দেখতে।

হোটেলের ম্যানেজার বলে, বাঙালীর সিজন এটা নয়। বাঙালীরা আসে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। পূজোর ছুটিতে।

ছুটি নেই বলে—আর নেই বা কেন? স্কুল কলেজের সামারের ছুটি। পরীক্ষার পর ছাত্রদের দীর্ঘ অবকাশ। মাষ্টারদের ছুটি।

তবে? বাঙালী কি এতোই দারিদ্র নিপীড়িত? বাঙালীর দেশ ভ্রমনের বাতিক বহু প্রচলিত। বাঙালী ছুটি পেলেই ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসে। সৌন্দর্য পিপাসা বাঙালীর অস্থিমজ্জায়। অথচ প্রকৃতির এই উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য রাজ্যে, এই মনোরম আবহাওয়ায় একটা বাঙালী দেখতে পাইনা। এ কেমন কথা?

আমি হাঁপিয়ে উঠি। আমার মন খুঁত খুঁত করে।

একটা বাঙলা কথা শুনতে পাইনা।

হোটেলে রকমারী জাতের সমন্বয়।

মুখের মধ্যে সকলেই ইংরেজী ভাষাভাষী।

ছেলে মেয়ে সকলেই ইংরেজী বলে। কাজেই তাদের বুঝতে কষ্ট হয় না। আমার মনে হয় দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষ বেশী সাহেব-ঘেঁষা এবং অনেক বেশী ইংরেজ ভাবাপন্ন হয়ে গেছে। বিশেষ করে বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ। রাজধানী দিল্লীর কথা স্বতন্ত্র। বোম্বাই তো রীতিমত আমেরিকান বনে গেছে। তাদের হাব-ভাবে চলা-ফেরায় বিশেষ করে মেয়েদের সাজ-সজ্জায় পুরোদস্তুর হলিউড। মেয়েদের প্রত্যেকেই নিজেকে সিনেমা-তারকা ভাবে।

সকলেই অনর্গল ইংরেজী বলে। তাই মনে হয় রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যতোই লাঠালাঠি হোক আর ইংরেজীকে দেশ থেকে নির্বাসিত করবার যতো রকম পরিকল্পনাই করা হোক, ব্যর্থ হতে হবে। ইংরেজ গেলেও ইংরেজী যাবে না। ইংরেজীই হবে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের একমাত্র ভাষা। দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র ভাষা। ইংরেজী দেশ থেকে লোপ পেলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

ইংরেজী দীর্ঘজীবী হোক !

বাঙলার প্রচণ্ড গরমের বাইরে শীতের হাওয়া আর রৌদ্রের কবোষ্ণ মায়া মনকে সজীব করে তোলে। সীমাহীন পর্বতমালার বিরাট মহিমময় দৃশ্য দেখে কল্পনা স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতির অবারিত ঐশ্বর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের কানে নতুন জীবনের নতুন বার্তা বহন করে আনে। হৃদয়কে উদার ও প্রশস্ত করে। যুগ যুগান্তের মানুষের পুরাকীর্তির মহিমা প্রচার করে।

বিভিন্ন জাতির এই একত্র সমাবেশের মধ্যে বাস করার একটা অভিনব আনন্দ আছে বই কি। শুধু আনন্দ নয় সার্থকতা আছে। তাদের বেশ-বাস, আচার-ব্যবহার, তাদের লোক সংস্কার এমন কি তাদের অন্দর মহলের পরিচয়টি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

পথে ভিন্ন নিজের দেশের মানুষকে চেনবার এমন সুযোগ আর কোথাও নেই।

দিন কাটছিল পরমানন্দে। পথে ঘাটে। বনে জঙ্গলে। হ্রদের তীরে তীরে। হ্রদের বুকে নৌকা বিহারে।

নইনিতাল হ্রদের পাহাড়। কিম্বদন্তী দক্ষযজ্ঞের পর মহাদেব যখন সতীদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় সতীর দেহ থেকে নয়ন খসে পড়ে পর্বত সানুদেশে এই হ্রদের সৃষ্টি হয়। তাই এর নাম নইনি (নয়ন) তাল। নইনিতাল ছাড়াও আশে পাশে আরো কটি হ্রদ আছে। ভীমতাল উল্লেখযোগ্য। বৈচিত্র্য আছে বই কি!

এতো বৈচিত্র্যের মাঝেও যে আমার জন্য এই বিস্ময়কর চরম বৈচিত্র্য অপেক্ষা করছিল, ভাববো কেমন করে?

আকস্মিকতার প্রচণ্ড ধাক্কায় আমার বাকরোধ হয়ে এলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। বিশ্বাস করবো কেমন করে? ধারণা করবো কেমন করে যে এক যুগ পরে এই বাঙালী বিরল পার্বত্য পথে এক শৈশবের অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। যে বন্ধুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজের এবং পুরোনো বন্ধু মহলে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কমসে কম পঁচিশ বছর যাকে চোখে দেখিনি বা কেউ দেখেনি বা উদ্দেশ পায়নি তাকে মৃত ভাবাই তো একান্ত স্বাভাবিক।

যাচ্ছিলুম নইনিতাল থেকে রাণীখেত। বাসে। সাঁইত্রিশ মাইল বাসপথ। প্রকৃতির সৌন্দর্যোচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে মনোরম পার্বত্য পথ। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথকে স্মরণে এনে দেয়। পথে একটা বাস স্টেশন বা বাস স্টপ আছে। জায়গাটার নাম গরম পানি। ছোট্ট একটা পাহাড়ি গ্রাম বা বস্তি। বাস স্টেশনের জন্যই এর যা কিছু গুরুত্ব বা গরিমা। যাত্রিদের জন্য ক-টা চা এবং জলখাবারের দোকান আছে। বেশ কিছুক্ষণ এখানে বাস থামে। এবং যাত্রিরা প্রায়

সকলেই বাস ছেড়ে মাটিতে নেমে পাখা ঝাপ্টানি দেয়। অলস দেহের জড়তা ভেঙ্গে নেয়। এবং গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে শরীরটাকে তাতিয়ে নেয়। জায়গাটার নাম গরম পানি কেন হলো ভাবতে ভাবতে আমিও বাস থেকে পথে নামলুম। পথের ধারেই একটা শীর্ণ ঝরনা। হয়তো বা হট-স্প্রিং হবে। কিন্তু না। একজন স্থানীয় যাত্রি বললে, না, নামের কোন যুক্তি নেই। পাহাড়ের নাম গরম পানি।

বাসে আমরা তুজন মাত্র বাঙালী। বাকি সব অবাঙালী এবং অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান নরনারী।

চায়ের দোকানে বেশ ভীড়। আরো তুখানা যাত্রি-বোঝাই বাস এসেছে। প্রায় সব যাত্রিই দোকানে নেমেছে। আমরা বাইরে ফাঁকায় একটা টেবিলে বসেই চা খাচ্ছিলুম। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অতিকায় বিস্ময় আমায় ধাক্কা দিল। আঘাতটা বুক থেকে পাঁজরের নিচের হৃদপিণ্ডে গিয়ে বাজলো। চোখ তুলে চেয়ে আর চোখ নামাবার শক্তি ফিরে পেলুম না। সামনে পাহাড় ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে পঁচিশ বছর পূর্বের মৃত অতীত।

কল্যাণ দত্ত। না নামটা মনে আছে বই কি! পাড়ার ছেলে। বাল্যের বন্ধু। রেনবো ক্লাবের একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা।

জনসমুদ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত একটা প্রবল ঢেউয়ের মতো সে আমার উপর ভেঙ্গে পড়ল।

—আরে, শ্যাম? তুই?

—কল্যাণ তো? দ্বিধাজড়িত স্বরে প্রশ্ন করলুম।

হেসে উঠলো কল্যাণ। আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, হ্যাঁ রে, সেই জেলেটোলার কল্যাণ। সেই রেনবো ক্লাবের কল্যাণ। তুই নির্ভুল। আমি তোকে অতখানি দূর থেকে চিনলুম আর তুই এই এতো কাছ থেকে আমায় ভুল করবি?

আবার হাসলো সে।

এক পেয়ালা চা দিয়ে টেনে বসালুম আমার পাশে। বললে, তোর কথা আগে বল। আমার কথা পরে শুনবি। আর শুনবিই বা কি? এ-টি তোর ছেলে নিশ্চয়ই।

সঙ্গে ছিল আমার ছেলে। বাবার পুরোনো বন্ধু জেনে সে আনত ভঙ্গিতে প্রণত হলো।

কল্যাণ তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে অনর্গল হয়ে উঠলো, চিনতে একটুও দেরী লাগেনা। তোমার বাবা আমার তোমার বয়সের বন্ধু। বুঝতে পারো তোমার বয়সের বন্ধুদের এ-বয়সে কতো মূল্য। পুরনো দিনের চেয়ে পুরনো দিনের স্মৃতি আরও মূল্যবান।

এমনি অনেক কথাই বললে সে। বাষ্পাচ্ছন্ন রুদ্ধ কণ্ঠে।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়েছিলুম। তার চেহারায় বিশেষ কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি তার প্রৌঢ়ত্ব। সেই অনর্গল হাসি। মাথার টেরি কাটার ভঙ্গিটি সেই পঁচিশ বছর পূর্বের। মাথায় অজস্র ঢেউতোলা কালো চুল। রগের কাছে কিছুটা সাদা হয়েছে মাত্র। না চিনতে ভুল নয় না মোটেই। শরীরের বাঁধুনি এখনো ঢিলে হয়নি।

—রাণীখেত বেড়াতে যাচ্ছিস তা বুঝেছি--

বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুই যাবি কোথায়?

হাসতে হাসতে কল্যাণ বললে, আমি এখানের পুরোনো বাসিন্দা। তোরা ভেবেছিলি হয়তো কল্যাণ দত্ত মরে গেছে। না?

—আমি বললুম, অনেকটা তাই। ভাবাটা কি অন্যায়? কিন্তু এখানে করছিস কি তাই বল?

- -সব বলবো। চলনা, আমার ডেরায়। কাল রাণীখেত যাস।

হঠাৎ থেমে নিজেই বললে, না। তা হবে না। বাসের টিকিট এখান থেকে পাওয়া কঠিন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোর ডেরা কতো দূর?

—বেশী দূর নয়। একটু আগে পথের ধারে একটা ডাক-বাঙলো লক্ষ্য করেছিস কি? ওরই একটু ওপরে।

আমি উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলুম, এখানে কি তুই কোন ব্যবসা ফেঁদেছিস?

—না ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি। কিন্তু—

হঠাৎ সে আমার হাতদুটি চেপে ধরে বললে, আমাকে কথা দিয়ে যা ফেরবার পথে আমার এখানে অন্তত একটা দিন থেকে যাবি?

আমি সরাসরি প্রতিশ্রুতি দিতে পারলুম না। বললুম, চেষ্টা করবো।

হঠাৎ তার মুখের চেহারাটা বেদনায় তরল হয়ে এলো। সে বাষ্পাকুল আর্দ্রকণ্ঠে আমার ছেলেকে বললে, তুমি বাবা, আমায় কথা দিয়ে যাওতো। ফেরবার পথে এখানে নামবে। এখানকার টিকিট কিনবে। আমার ডেরায় অসুবিধা বুঝলে আমি ডাক-বাঙলোয় তোমাদের জায়গা করে দোব। পাইন ফরেষ্টের মধ্যে পরিচ্ছন্ন বাঙলো। খুব ভালো লাগবে।

তার আগ্রহাতিশয্য ও আন্তরিক অনুনয়কে উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য। প্রতিশ্রুতি দিলুম ফেরবার পথে তার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

স্মৃতির সমুদ্র উন্মথিত করে সে পুরোনো দিনের কাহিনী আবৃত্তি করলো। বললে, বাইশ বছর বাঙলা দেশের মাটিতে পা দিইনি।

বাস ছেড়ে দিলেও সে বারবার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিল: নিশ্চয় আসবি—আমি সব ব্যবস্থা করে রাখবো—

প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখতে রাণীখেত থেকে ফেরবার পথে গরম পানিতে নামলুম।

কল্যাণ বাস স্টেশনে হাজির ছিল। হাসিমুখে সে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো।

ছুটো পাহাড়ি কুলি আমাদের মোট-ঘাট পিঠে বেঁধে এগিয়ে গেল।

রাণীখেতের গল্প করতে করতে বাসের পথ ধরে আমরা এগিয়ে গেলুম।

পাইন কুঞ্জের মধ্যে চড়াই পথ। বাস পথ থেকে পাহাড়ের গা-বেয়ে উপরে উঠে গেছে। ছায়া শীতল পথ। পথে ঝরা পাতার আস্তরণ। কোথাও লতাবিতান, অরণ্যপুষ্পের মধুর সৌরভ। সর্পিল পথ ভেঙ্গে, পাইন পপলারের বূ্যহ ভেদ করে, ডাক বাঙলোর পাশ কাটিয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে আমরা একটি ছোট বাঙলোর সামনে এসে দাঁড়ালুম।

—এই আমার আস্তানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কল্যাণ মৃদু হাসলো। বাতাসে পাইনের বিষাদ মর্মরের মতই সে দীর্ঘ নিশ্বাস।

আমি এতোখানি খাড়াই পথ ভেঙ্গে বেশ একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলুম।

হাঁপাতে হাঁপাতেই বাঙলোর পানে চেয়ে বললুম, আস্তানা না আশ্রম ?

হেসে উঠলো কল্যাণ ঃ কেন ? অনেক ফুল ফুটেছে বলে।

হঠাৎ তার মুখের হাসি গেল নিভে।

শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সে পেছনের পাহাড়ের অরণ্য জটলার পানে চাইলো।

ফুল ফুটে আছে থরে থরে।

মাটিতে। টবে। ছোট ছোট কাঠের বাক্সে নানা জাতীয় ফুলের গাছ। ডালিয়া। বনগোলাপ। বিগোনিয়া। কেনা।

বিচিত্র বর্ণসমারোহ।

—এ সব কার শখ ?

অবশ, আচ্ছন্ন গলায় কল্যাণ উত্তর দিল, ওই ওদের। ঐ মেয়েটির। আর—

বাঙলোর বাইরে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে পা-দুটি বুকের কাছে দুমড়ে পথের দিকে চেয়ে বসে আছে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে।

হিন্দুস্থানী ঠঙে শাড়ি পরা। গুচ্ছগুচ্ছ এলোচুলগুলো কাঁধ বেয়ে বুকের ওপর লুটোচ্ছে। মুখে আরণ্যক মায়া।

—তোর মেয়ে নাকি ?

ঢোঁক গিলে মুখ ঘুরিয়ে ঘাড় নাড়ল কল্যাণ।

বোঝা গেল না 'হ্যাঁ' কি 'না'।

তার নিবাপিত নির্লিপ্ত ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন সে প্রসঙ্গটা স্থগিত রাখতে চায়।

কিন্তু মেয়েটিকে আমার যথোচিত ভালো লেগেছে। শুধু ভালো লাগেনি একটা অপূর্ব বিস্ময় উথলে উঠেছে আমার বাৎসল্যের বক্ষতটে।

এই অজস্র ফোটা ফুল আর ঐ ফুলের মতো মেয়েটি যেন মুহূর্তে আমার চোখে কল্যাণের মর্যাদা বাড়িয়ে দিল। উন্মোচন করে দিল তার সৌন্দর্য পিপাসু অন্তরকে। অতীতে কল্যাণ ছিল প্রচণ্ড সৌখিন। তার সৌন্দর্য চেতনায় ছিল একটি অনাবৃত শুভ্রতা। তার মনের আকাশে ছিল নির্মেঘ, নির্মল প্রশান্তি। এই ফুল আর সৌন্দর্য-ময়ী মেয়েটিকে দেখে মনে হলো এ তার অতীত জীবনের বিশাল প্রতিধ্বনি। উপকরণেব ঘটা না থাক তবু তার এই জীর্ণ কায়িক আস্তিত্বের অন্তবাল থেকে আজো নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়নি তার প্রাণের উত্তপ্ত পরিচয়। জীবনের দীর্ঘ পথের গতির ধূলায় ধূসর হয়ে যায়নি তার সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলো।

পাহাড়ের একটা খাঁজের উপর ঝুলন্ত বাঙলো। তারই সামনে একফালি বারান্দা। সেই বারান্দার পাথুরে মাটিতে ফুলের চাষ।

আড়ম্বর নেই। রিক্ততাও নেই।

পেছনের উঁচু পাহাড়টা যেন বাঙলোটিকে ঝড় ঝাপটা থেকে সস্নেহে বাঁচিয়ে রেখেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরদিকে উঠে গেছে আঁকাবাঁকা পথের শাখা প্রশাখা। পথের ধারে ছোট ছোট বাড়ি ঘর। দেশলাই-এর খোলের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রূপকথার রাজ্যের মতো।

সব চেয়ে ভালো লাগলো, এর নিবিড় নির্জনতা। পৃথিবীর কোলাহল, তুচ্ছ সুখ-দুঃখ সেখানে পৌঁছয় না।

কল্যাণ বললে, আমার আপিস ঐ ডাক-বাঙলোর বাইরে ক-টা ঘরে। একটু বিশ্রাম কর। তারপর ডাক বাঙলোটা দেখিয়ে আনবো। চমৎকার বাঙলো। ইচ্ছে হয়তো রাত্রে ওখানেও থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কল্যাণের ঘরে ঢুকে কিন্তু আমি চমকে গেলুম। এ আবার কী? ঘরের আষ্টেপৃষ্ঠে মানে চারটে দেয়ালে শুধু নারীমূর্তি আঁকা ক্যালেণ্ডারের ছবি। একখানা পুরুষের ছবি নেই। একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ বা মন্দিরের ছবি নেই। শুধু নারীমূর্তি। তার মাঝে অবশ্য দেবীমূর্তিও আছে।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম।

কল্যাণ আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে হেসে উঠলো: ও একটা আমার হবি। পাগলামীও বলতে পারিস।

—অর্থাৎ?

গম্ভীর হয়ে কল্যাণ উত্তর দিল, আমি নারী পূজারী। আমি দেবী উপাসক।

আমি প্রশ্নাকুল দৃষ্টিতে তারপানে চাইলুম।

ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে একটি আধা-বয়সী মহিলা। সম্ভ্রান্ত, প্রিয়দর্শনা। সুবেশা।

কল্যাণ বললে, বাইরে যে মেয়েটিকে দেখলি, ওর নাম নিরালা। আর এই নিরালার মা। নাম আনন্দী।

আমি আনন্দীকে নমস্কার করলুম। আনন্দী চায়ের ট্রে-টা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে আমাকে প্রতিনমস্কার করে খিল খিল করে হেসে উঠল। কল্যাণকে বললে, নিরালার মা-ই আমার শোভন পরিচয়, না কল্যাণ ?

আমি বিস্মিত হলুম আনন্দীর মুখে কল্যাণের নাম শুনে। কল্যাণের স্ত্রী নয় আনন্দী ? অবাক হয়ে তার মুখের পানে মুহূর্ত চোখ তুলে তাকালুম। আনন্দীর সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা নেই।

কল্যাণ অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে বিড়-বিড় করে ইংরেজিতে বললে, ইয়েস, সো ফার ফর দি প্রেজেন্ট।

নিঃশব্দে নতমুখে মৃদু হাসল। মুখ তুলে আনন্দী আমার পানে চেয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, কল্যাণের প্রকাশ ভঙ্গিটা দুর্বল চিরদিন।

কল্যাণ যেন বেগটা সামলাবার জন্যই সশব্দে হেসে উঠলো। লজ্জা প্রতিরোধের হাসি। বললে, আমার বিশিষ্ট বাল্য বন্ধু, শ্যামচাঁদ রায়। কাল তো এর কথা সব বলেছি।

আনন্দী বেশ ঘরোয়া সুরেই বললে, আমি দাদা বলবো।

— বসুন দাদা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চা খেয়ে নিন। তারপর ভালো করে আলাপ কববো।

চা ঢালতে ঢালতে বাঁকা চোখে আনন্দী বললে, আপনাকে চমকে দিলুম না কি ?

আমি তার মুখপানে চেয়ে বললুম, তা একটু দিয়েছেন বই কি !

ঠোঁট মুচড়ে মৃদু হেসে আনন্দী বললে, আমাকে তুমি বলবেন। দাদা বলেছি। চমকে দিয়ে থাকি তো ছোট বোনের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।

কল্যাণ নিঃশব্দে তারপানে চেয়ে মৃদু হাসল। সেই হাসির মাঝেই

তাদের অনেক কথা হয়ে গেল। সে হাসির মাঝে কোন আড়াল নেই।

আনন্দী বললে, কিন্তু দাদাকে যে তুমি ভাবিয়ে তুলেছো।

—বেশ তো। তুমিই ওর ভাবনার নিরসন করে দিও। ও সাহিত্যিক। তোমার জীবন ইতিহাস থেকে ও একটা কাব্য রচনা করতে পারে।

চোখে ঝিলিক দিয়ে আনন্দী আমার পানে চাইলো।

—তাই বুঝি?

কল্যাণ প্রশ্ন করলে, এখনো লিখিস তো?

—লিখি। তবে তোরই মতো আমার সাহিত্য জীবন অন্ধকারে অজ্ঞাতবাস করছে।

—তার মানে?

—একটা ছদ্মনামে কিছু কিছু লিখি। অভ্যাসটা ছাড়তে পারি নি। প্রায় নেশার মতোই বদ অভ্যাস।

আনন্দী আর কল্যাণ একসঙ্গে হেসে উঠলো।

আনন্দী বললে, আমরা তো বাঙলা ভুলেই গেলুম। অথচ ছাত্রী জীবনে বাঙলা সাহিত্য ছিল আমার প্রাণ। কী ভালোই বাসতুম।

প্রকাশ পেল এক অপূর্ব বিস্ময়। কল্যাণের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে পথের মাঝে দেখা হওয়ার চেয়ে অধিকতর বিস্ময়। আমি ধারণা করতেও পারিনি যে আনন্দী বাঙালী। তাকে আমি উত্তর অথবা মধ্য প্রদেশের মহিলা ভেবেছিলুম। আমি নিঃশব্দে বিস্ময়রূপিণীর মুখের পানে চোখ তুলে তাকালুম।

দুজনে দৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ হলো।

একখানা আশ্চর্য আর অপূর্ব ছবি চোখের পর্দায় ফুটে উঠলো। আমার মুগ্ধ পুরুষচিত্ত সে সৌম্য প্রশান্ত কান্তির প্রশংসায় অনর্গল হয়ে উঠলো।

কে বলবে প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে এসে পৌঁচেছে। দীঘল সুষ্ঠু দেহের কোন প্রান্তে নেই একটু জড়িমা। মুখের রেখায় তারুণ্যের রক্তিমা। বড়ো বড়ো চোখ দুটিতে দৃষ্টিশক্তির প্রখর আলো ঢেউ খেলে যাচ্ছে। নিরেট রুক্ষ পাহাড় ফেটে যেন ঝরণা উথলে উঠেছে। তার সর্বাঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর। সংস্কারের বালাই নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মতোই উদ্ধত, উজ্জ্বল ও উদ্দীপ্ত। ওর অন্তর্লোকে অনন্ত রহস্য।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে কল্যাণের মুখের পানে চাইলুম।

কল্যাণ হাসতে হাসতে বললে, চেনবার চেষ্টা করেও চিনতে পারছিস না। অথচ দেখেছিস নিশ্চিত।

আমি অবাক হয়ে আনন্দীর পানে তাকালুম।

কল্যাণ চায়ের বাটিতে চুমুক দিল।

আনন্দী মুখ টিপে হাসছে।

নিরালা এসে ঘরের দোরে দাঁড়ালো। একটা আলোর বন্যার মতো।

কল্যাণ তাকে ডাকলো ঃ এসো, জেঠামণির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

মেয়েটি ধীর পায়ে এগিয়ে এসে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে প্রণাম করলো।

আমি তাকে দুহাতে তুলে ধরলুম। নিরালা শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু হাসলো। সে হাসিতে পার্বতীয় নির্ঝরের স্বপ্ন।

আবার একটা বিস্ময়। আঘাতের বেদনায় বুক টনটন করে উঠলো।

নিরালা অন্ধ।

কল্যাণ বললে, বছর চার পূর্বে ওর ব্রেন টিউমার হয়। তারি ফলে ও চোখের দৃষ্টি হারায়।

অস্ফুট আর্তস্বরে আমি প্রশ্ন করলুম, তারপর ?

—চিকিৎসায় কোন ফল হলো না। এখনো আলমোরার এক সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসায় আছে।

নিরালা কথা বললে : কিছু উপকারও হয়েছে। একটা চোখের ভিশন ফিরে এসেছে। স্পষ্ট না হলেও আলো দেখতে পাই—

আনন্দীর মর্মমূল থেকে ভেসে এলো একটা কম্পিত দীর্ঘশ্বাস।

আমি তারপানে তাকালুম। চোখোচোখি হতেই সে বেদনা বিধুর মুখখানি নত করল। বুঝতে বাকি রইলো না মা-র বুকের নিচে একটা ব্যথার জোয়ার উঠেছে।

আমি নিঃশব্দে নিরালার একখানি হাত ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম।

নিরালা প্রাণখুলে আমার সঙ্গে আলাপ জমালো। মধুর তার কণ্ঠস্বর। অপূর্ব তার বাচন ভঙ্গি। অনর্গল ইংরেজী বলে। বুঝতে বাকি রইলো না যে এরা সচরাচর নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলে। বিকল্পে হিন্দী। বাঙলা বলে কচিৎ।

এদের এই সুদীর্ঘ জীবনের অস্পষ্ট ইতিহাস আমার কৌতূহলকে অধৈর্য করে তুললো। এর সবটাই যেন দুর্ভেদ্য রহস্য দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের অন্তর্দেশের মতো। হৃদয়ে না প্রবেশ করলে উপলব্ধি করা দুরূহ।

কল্যাণের স্ত্রী নয় আনন্দী! আনন্দী নিরালার মা। কল্যাণের সঙ্গে এদের সম্বন্ধটা কি?

মনে কেমন খটকা লেগেছে।

যাক। আমি তো ওদের বিচার করতে আসিনি। ওরা না জানালে প্রশ্ন করে জানবার ও আমার অধিকার নেই।

ওরা আদর করে অভ্যর্থনা করে ডেকে এনেছে তাই আসতে পেরেছি।

নিজের ওপর বিরক্ত হলুম। অশোভন ঠেকল নিজের এই বিসদৃশ কৌতূহল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কল্যাণ আর আনন্দী এসে আমার কাছে বসলো।

কল্যাণ বললে, এইবার কফির পেয়ালা নিয়ে আঁট হয়ে বসে আনন্দীর কাছে শোনো, আমাদের এই সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অব্যক্ত কাহিনী। দীর্ঘ বাইশ বছরের এই অজ্ঞাতবাস আমাদের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, বাঙালীর সাড়ম্বর সংস্কার। আমাদের জীবন যাত্রায় কোন জনতা নেই। নেই কোন জটিলতা। আমাদের প্রেমের আদর্শকে অসম্মানের কাদামাটি থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমাদের এই পলায়ন। আমরা আমাদের সেই আদর্শকেই পূজা করি। প্রকৃতির কোলে শুয়ে সেই আদর্শকে আঁকড়ে ধরে এই দীর্ঘদিন কাটিয়েছি।

গায়ে একখানা কালো স্কার্ফ জড়িয়ে আনন্দী সামনে বসে মৃদু মৃদু হাসছিল।

সে ঘাড় নেড়ে, কাঁধের উপর গুচ্ছ করা চুলের খোঁপাটা দুলিয়ে মধুর কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ দাদা, আমাকেই বলতে হবে এর ইতিহাসটা। কারণ এর দায় দায়িত্ব আমার। আমিই তোমাদের কল্যাণকে ঘরছাড়া করেছি। দেশ ছাড়া করেছি। ওর ভালোবাসার নিষ্ঠা আমাকে চমকে দিয়েছে। আমার বিড়ম্বিত জীবনকে সার্থকতায় ভরিয়ে তুলেছে। ওর ভালোবাসাকে রূপায়িত করবার জন্যেই আমাদের জীবন ইতিহাস অবসর মতো আমি নিজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

কল্যাণ বললে, আনন্দী ইজ এ ভেরি গুড স্পিকার। সি ইজ অ্যান আউট অ্যাণ্ড আউট স্টোরি-টেলার।

চোখে ঝলক দিয়ে আনন্দী বললে, বাট দিস ইজ নট এ স্টোরি ডার্লিং!

—সরি! কল্যাণ বশ্যতার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল।

কল্যাণের ভালোবাসার চেহারাটা আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎচকিত হয়ে উঠলো।

আনন্দী অদ্ভুত! আনন্দী আশ্চর্য।

মোলায়েম শুভ্র কণ্ঠে ধীরে ধীরে আনন্দী ব্যক্ত করলো তাদের অন্তর্গূঢ় প্রেমের কাহিনী। অন্তরের গোপন সত্য এমনভাবে প্রকাশ করতে কেউ পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাকে আনন্দী যেন একটা নতুন আলো দেখালো। আমাকে পৌঁছে দিল এক অসন্দিগ্ধ সত্যের পথে।

তাদের সেই কাহিনীই এই উপাখ্যানের উপজীব্য।

এ কাহিনী আমি সঙ্কলন করেছি আনন্দীর স্বলিখিত একখানি রোজনামচা হতে এবং বাকিটা তার বিবৃতি থেকে। আনন্দী সাদরে এবং সস্নেহে আমাকে উপহার দিয়েছে তার সেই জীবন ইতিহাসের রোজনামচাটি।

গৌরী। গিরিরাজ নন্দিনী গৌরী নয়।

সাধারণ গেরস্ত ঘরের মেয়ে। পাঁচটা গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতোই তাকেও পথে ঘাটে চলাফেরা করতে হতো। যেতে হতো স্কুলে।

তার পৈতৃক বাড়ি ছিল কলকাতার সিমলা কাঁসারিপাড়া অঞ্চলে। ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে। বড়ো বড়ো টানা কালো চোখ। চোখে বুদ্ধির স্বচ্ছ আলো। মাথায় এক মাথা ঢেউ খেলানো কালো চুল। দেহের লাবণ্য ছাড়াও তার কালো চুলের বাহার পথের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

কিশোরী গৌরী প্রায়ই আসতো জেলেটোলায় তার দিদির শ্বশুর বাড়ি।

পাশের বাড়ির ছেলে কল্যাণ দত্ত গৌরীকে স্বপ্ন-আঁকা রঙিন চোখে দেখলো। উনিশ বছরের ছেলে। নব যৌবনের নতুন আলো তার চোখ ঠিকরে পড়ছে।

কলেজে পড়ে। রোমিও জুলিয়েট তাদের পাঠ্য। পড়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর। পড়েছে শরৎচন্দ্রের দেবদাস। গৌরীকে সে তার জুলিয়েট ভাবে। নিজের অন্তরের মাধুরী দিয়ে তাকে কল্পনা করে নব নব রূপে। রচনা করে নব নব ছন্দে। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে। সুযোগ সুবিধা হয় না।

না হোক। সে চোখে দেখেই খুশি। তারি মাঝে তার নতুন ভাবাবেগ গতি পায়। চোখের ভালো-লাগার মাঝেই একটা রোমাঞ্চকর আনন্দ অনুভব করে। সে এক বিস্ময়কর অনুভূতি। অভূতপূর্ব আনন্দ চেতনা।

দ্রুততালে গৌরীকে কেন্দ্র করে তার এই আনন্দ চেতনা পথের ধূলো উড়িয়ে তাকে উধাও করে ছুটিয়ে নিয়ে যায় এক স্বপ্নালোকিত কাব্যলোকে।

গৌরী হয়ে ওঠে তার কাব্যসঞ্চয়ন। তার কবিতা। তার প্রেমগীতিকা।

গৌরী তার মানসী। তার অপরূপ উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি নিয়ে কতো কবিতা রচনা করলো। তার কালো বেণীর পাকে পাকে কল্পনা করলো বন্ধনের মধুময় অভ্যর্থনা।

গৌরী তার জীবনের প্রথম কাব্যোদয়। ছন্দ, অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের দীপশিখায় গৌরীকে সে আরতি করে। ঘুম ভাঙে গৌরীর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ভেবে। গৌরীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে সময়ের তার হিসেব থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে হাজিরা দিতে পারে না। অধ্যাপকের বক্তৃতা শ্রুতিগোচর হয় না। হলে হাস্যকর মনে হয়। গৌরীকে কবিতার রূপ দিতে দিতে বিনিদ্র রাত্রির প্রহর যাপন করে।

কলেজের পথে দৈবাৎ কখনো গৌরীর সঙ্গে দেখা হয়। সহপাঠিনীরা তার সঙ্গে থাকে। পরিচয় করবার সুযোগ বা সাহস হয় না কল্যাণের। সৌজন্যে বাধে।

হয়তো বা কখনো দুজনে চোখোচোখি হয়। মনে হয় গৌরীর ঠোঁটের কোণে মৃদুরেখায় হাসি ফুটে ওঠে। কুয়াশার অন্তরালে এক ফালি নির্মল নীল আকাশ দেখতে পায় কল্যাণ। তার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সে একটা বিশালতার স্বাদ পায়। তার গতি নতুনতরো বেগ পায়।

গৌরী ম্যাট্রিক পাশ করলো।

কল্যাণ আনন্দে হাঁপিয়ে উঠলো নিজে পাশ করেও তার এতো আনন্দ হয় নি।

সে যে কি করবে, কেমন ভাবে তাকে অভিনন্দন জানাবে ভাবতে বসলো।

একটা কিছু না করলেই নয়।

অনেক ভেবে চিন্তে সে গৌরীকে কন্‌গ্রাচুলেশন জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে বসলো।

গৌরী চিঠিখানা পেয়ে প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, অপরিচিত বা প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই ভেবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে একটা আনন্দ অনুভব করলো, তাকে শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ভেবে।

পরিচয় আছে বই কি। বাক্যিক পরিচয় না থাকলেও চাক্ষুস পরিচয় আছে বই কি! দিদির প্রতিবেশী। মেধাবী ছাত্র বলে খ্যাতি আছে।

চিঠিখানা বারবার পড়লো গৌরী। ভালো লাগলো চিঠিখানা পড়তে। লেখার বাঁধুনি আছে। স্নেহস্পর্শ আছে। নির্জলা প্রশংসাগুলো কাণে মধু বর্ষণ করলো।

দেখা হলো কল্যাণের সঙ্গে দিন দুই পরে।

কল্যাণ বসেছিল বাড়ির রোয়াকে। গৌরীকে আসতে দেখে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। গৌরী পাশের দিদির বাড়ির দরজায় মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো।

কল্যাণের বুক দুর-দুর করে উঠলো।

গৌরী তার দিকে এক ঝলক হাসি ছুড়ে দিয়ে মধুর ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বললে, ধন্যবাদ।

কল্যাণের রক্ত নেচে উঠলো। মনে হলো জীবনের একটি চরম মুহূর্তের সূচনা নিয়ে এসেছে গৌরী। যে পটভূমি সে রচনা করেছে তার উপর একখানি কোমল আলেখ্য এঁকে দিয়ে গেল। তার সর্বাঙ্গে একটা রোমাঞ্চ জাগলো।

কিন্তু তার দিকে সে এক পাও এগোতে পারলে না। বলবার মতো

গলায় অনুকূল কোন ভাষা খুঁজে পেলো না। সে পাথরের নিরেট মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল করে তারপানে চেয়ে।

ভিতর থেকে গৌরীর হাসির কলধ্বনি ভেসে এলো।

আবার সেই দুঃসহ নির্জনতা। সেই আকাশহীন অন্ধকার দিন। সেই নিরবচ্ছিন্ন নির্জীব স্তব্ধ রাত্রি।

সে এসেছিল দেহে নিয়ে নতুন লাস্য, চোখে নিয়ে নতুন ইশারা, কণ্ঠে ভরে নতুন আমন্ত্রণ। কল্যাণ পারলো না নিজেকে উচ্চারণ দিতে। তাই সে ফিরে গেল।

নিজের উপর রাগ হয় কল্যাণের। নিজের অযোগ্যতায় নিজের উপর ধিক্কার জাগে।

আবার কিছুদিন কেটে যায় স্তব্ধতার ঘোরে।

যে স্রোতে সে ভাসমান, তার নিয়ম মেনে তাকে চলতেই হবে। ভেসে যেতে হবে স্রোতের আবর্তে। চঞ্চল হলে চলবে কেন? উদ্দাম হয়ে তো তাকে চমকে দেওয়া চলে না।

না না। মন তো তার কামনায় পঙ্কিল নয়। প্রয়োজন হয়তো সে তাকে গোপন রেখে দেবে চিরকালের মৌনতায়। প্রতীক্ষা করবে অনন্তকাল। দমকা হাওয়ার মতো আকস্মিকতার ধাক্কায় তার মনের রুদ্ধ দরজা জানলাগুলোকে কাঁপিয়ে তুলতে পারবে না।

সে তাকে ধ্যান করে চিন্তার গভীরে ডুবে থাকতে চায়। সমগ্র অনুভূতিতে তার অস্তিত্ব কল্পনা করে সে অনির্বচনীয় পুলক অনুভব করে। গৌরী তো তার মনে মোহ জাগায় না। জাগায় বিস্ময়। জাগায় আশংসা।

সে যে গৌরীকে ভালোবাসে, তাকে যে সে ভালোবাসতে পেরেছে এই সত্যটি হৃদয়ে অনুভব করেই সে মর্মান্তিক সুখ পায়।

পথে ঘাটে আজকাল গৌরীর সঙ্গে দেখা হলে গৌরী তাকে মৃদু

হাসি দিয়ে পরিচয়ের ক্ষুদ্র স্বীকৃতি দেয়। সৌজন্যতার খাতিরে হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে হয়তো বা সজ্জিপ্ত একটি অভিবাদন জানায়। কিন্তু মুখ খোলে না।

গৌরীর মাঝে একটি নম্র গাম্ভীর্য ছিল যাকে সমীহ করতো কল্যাণ। কল্যাণের প্রকৃতিটাও ছিল লাজুক। মেয়েদের সম্বন্ধে তার মনের স্পর্শবোধ ছিল অতি সূক্ষ্ম ও পেলব। কাজেই কাছাকাছি হয়েও তাদের দূরত্বের আড়াল ভাঙলো না। তারা দূরেই রয়ে গেল।

কাছে আসবার ঔৎসুক্য তো গৌরীর ছিল না। তার মুখের রেখার ফুটতো না অনুরাগের রক্তিমা। দেহের ভঙ্গিতে ছিল না প্রতীক্ষার প্রশ্রয়। সজ্জিপ্ত হাস্য ও দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই তাদের সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে যেতো।

গৌরীর সন্নিকট সান্নিধ্যে কল্যাণের দেহমন সঙ্গীত স্পন্দিত হয়ে উঠতো কিন্তু কণ্ঠে সে সুর ঝঙ্কৃত হবার আগেই গৌরী বেণী দুলিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে পিঠ দেখাতো।

সে সুঠাম পিঠের ও সুষমা কম নাকি? কালো কুচকুচে বিনুনী বেণীর অন্তের লাল ফিতের ফাঁসটা সাপের আগুনে জিবের মতো কল্যাণের বুকে ছোবল দিত।

কল্যাণের পা মাটিতে বসে যেতো। সে তাকে দেখবে না নিজে চলবে?

তার চোখের দেখা শেষ হয়ে গেলে অনুভূতির চোখ দিয়ে সেই অপার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে করতে আবার সে ফিরে যেতো তার নিঃসীম নির্জনতায়। বসতো গিয়ে ধ্যানের আসনে। রাত্রি ঘন হয়ে উঠতো। তিমির স্তব্ধ রাত্রির আত্মার মতো তার চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে একটি ধ্বনি বিরহিত সুর বেজে উঠতো। তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেতো। স্বপ্নের ঘোরে রাত কেটে যেতো।

পরীক্ষা আসন্ন।

তবু তার মাথার বরফ গললো না। তার মনের অন্তরীক্ষ জুড়ে একটা বিরাট নৃত্যোৎসব চলেছে। তার সমস্ত চেতনা এমন সূক্ষ্মস্তরে গিয়ে জমাট বেঁধেছে যেখানে স্থূল পরীক্ষার উত্তাপ গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

সে তার চলাকে থামাতে চায় না। স্থগিত রাখতে চায় না।

দুদিন পরীক্ষা দিল কোন রকমে। তৃতীয় দিন সকালে গৌরীর কণ্ঠস্বর তাকে চকিত করে তুললো।

পাশের বাড়িতে গৌরী এসেছে তার দিদিকে আর জামাইবাবুকে নেমন্তন্ন করতে।

তার জন্মোৎসব।

কল্যাণের ভিতরের জমাট বরফ গলে উত্তাল তরঙ্গ তুললো গৌরীর পদশব্দে ও হাসির কলধ্বনিতে।

কল্যাণ বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে রইলো। তার দর্শন আশায়। ভুলে গেল পরীক্ষার কথা।

নিদারুণ লজ্জা থেকে তাকে রক্ষা করলো তার এক সহপরীক্ষার্থী।

—কি রে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

—এই যাই।

যেতে হলো তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে।

প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো আচ্ছন্নের মতো।

একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তখন আর সকল প্রশ্নকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে : গৌরীর জন্মতিথিতে তাকে কোন উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানানো উচিত কিনা ?

উচিত অনুচিতের প্রশ্ন তাকে আকুল করে তুলেছে, সে পরীক্ষার প্রশ্নে মন দেয় কেমন করে ?

সে উদভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ এক সময় পরীক্ষার

হল থেকে বেরিয়ে গেল। এবং সোজা নিউ মার্কেট গিয়ে একটা উপহারের সামগ্রী নির্বাচন করতে ব্যস্ত হলো।

অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা ভালো ভ্যানিটি ব্যাগ কিনে সে বাড়ি ফিরে এলো।

ভুলে গেল পরীক্ষার কথা।

অনেক তদবির করে ব্যাগটা গোপনে পাঠাতে হলো গৌরীর কাছে। ব্যাগের ভিতর রইলো দাতার পরিচয় পত্র।

চমকে গেল গৌরী। লজ্জিত ও হলো মনে মনে।

দিদির উপর রাগ করে বললে, তোমার পাশের বাড়ির লোক। তুমি একবার মনে করিয়ে দিলে ভদ্রলোককে না হয় নেমন্তন্ন করতুম।

দিদি হাসলো। ভ্রুভঙ্গি করে বললে, তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। একদিন গিয়ে আলাপ করে আসিস।

—আলাপ আমার সঙ্গে আছে। এটা তুলে রাখো।

গৌরী গ্রহণ করলো সেটা স্নেহের দান বলে। ফেরত তো দিতে পারে না। শালীনতায় বাধে।

দেখা হলো তুজনে প্রায় মাসখানেক পরে। পথের মাঝে।

গৌরী নমস্কার করে প্রথমেই কথা বললে : আমাকে অমন করে লজ্জা দিলেন কেন, ব্যাগটা পাঠিয়ে ?

—অন্যায় করেছি ?

অপরাধির মতো কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে তার পানে তাকালো কল্যাণ।

হাসি পেল গৌরীর তার মুখের ভঙ্গি দেখে। কিন্তু সে হাসলো না। সরু ভুরুতুটি কপালে তুলে অপরূপ ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, ন্যায় অন্যায়ের সংজ্ঞা তো সকলের সমান নয়। তবে আমাকে অত্যন্ত লজ্জা দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে আমার এমন কোন ঘনিষ্ঠতা বা স্নেহের সম্পর্ক নেই যাতে আপনি আমাকে স্নেহ উপহার দিতে

পারেন, বা আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করতে পারি। অবিশ্যি আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করলে আপনার দেওয়াটা অসঙ্গত হতো না।

গৌরীর কথাগুলো শ্রুতিমধুর হলেও কল্যাণকে ব্যথিত করে তুললো। ব্যথা পেল গৌরীকে বিব্রত করে তুলেছে ভেবে। গৌরীর পাশে দাঁড়িয়েও তার মনে হলো সে অনেক দূরে। কাছে যাবার মোহে, গোপনে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার লোভে তাকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে অনর্থক সে তাকে অপমানিত করেছে। তার কৌমার্যকে লজ্জিত ও বিব্রত করে তুলেছে। তার এতো কাছে দাঁড়িয়ে আর যেন তার মৌখিক বন্ধুতার দাবি পর্যন্ত নেই। তার সঙ্কোচের অবধি রইলো না। সে চোখ তুলে তার মুখপানে তাকাতে পারলো না। সর্বাঙ্গ তাঁর ঘামে ভিজে উঠলো।

অপদস্থ কল্যাণের ম্লান মুখের পানে চেয়ে বুঝি বা গৌরীর মনে করুণার আমেজ জাগলো, সে মুখে একটি ললিত হাসি ছড়িয়ে প্রশ্ন করলে, পরীক্ষা কেমন হলো বলুন।

—পরীক্ষা ? পরীক্ষা তো আমি দিই নি।

—পরীক্ষা দেন নি ? কেন ?

—তৈরী করতে পারিনি। অনর্থক ফেল করার দুর্ণাম কিনে লাভ কি ?

গৌরী নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে কি ভাবলো, তারপর মৃদু হেসে বললে,

—তা ঠিক। ভালো করেই পাশ করতে চান। তবে আবার একটা বছর—

গলা চেপে হাসলো গৌরী।

রসনায় জোর পেয়েছে কল্যাণ। সে বলে উঠলো, এক বছরে পৃথিবী রসাতলে যেতে পারে। আর পরীক্ষায় পাশ করাটাই তো জীবনের চরম সম্পূর্ণতা নয়। মনের অপার শূন্যতাকে কী ভরিয়ে তুলতে পারে য়ুনিভার্সিটির একটা ডিগ্রি ?

গৌরী তির্যক ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে শরীরে একটা তাচ্ছিল্যের ঢেউ তুলে বললে, এখন আসি। নমস্কার।

হাসিটাকে আড়াল দেবার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ ছাতাটা খুলে গৌরী দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

কল্যাণ হাঁফিয়ে উঠলো। তার উচ্ছ্বসিত আবেগের মুখে যেন একখানা পাথর চাপা দিয়ে গেল গৌরী। হৃদয় থেকে অনেক কথাই জলের ভারী তোড়ের মত কণ্ঠে পিছলে এসেছিল কিন্তু সে উচ্চারণ দিতে পারলো না। উদগীরণ করতে পারলো না। তার রসনা অবশ ও অসাড় হয়ে গেল। সে সর্বাঙ্গে একটা অননুভূত বেদনা অনুভব করলো। গৌরীর পায়ের উড়ন্ত ধূলায় তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল।

মাসের পর মাস কেটে গেল। বছর ঘুরে গেল। সময়ের রূঢ় আঘাত কল্যাণের মনে কোন পরিবর্তন আনতে পারলে না। গৌরীর নির্মম নির্লিপ্তি ও কঠোর ঔদাসীন্য ও তাকে টলাতে পারলে না। পারলে না তার মনের আগুন নেবাতে। বরং দিনের পর দিন সত্যের শুভ্র আলোর মতো অনির্বান শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠলো। মনের আকাশ তো তার কামনার কালো মেঘে ঘোলা নয়। নির্মল নির্মেঘ আকাশ। সেখানে শরতের শুভ্রতা। বসন্তের ঔদার্য। হেমন্তের স্নিগ্ধ নীলিমা। সে আকাশে দাহ নেই।

আছে দীপ্তি। আছে মুক্তির আভাস। প্রসন্ন প্রশান্তি।

সে কবি। সে ধ্যানী। সে সাধক।

তার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবে কে? ধ্যানের আসন থেকে নামিয়ে নেমে কে? তার নিভৃতির নির্জনতা ভেঙ্গে দেবে কে?

গৌরীর কায়িক উপস্থিতির চেয়ে তার প্রকল্প ধ্যান মূর্তির প্রেরণা কি কম নাকি?

গৌরীকে ভাবা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এ ভাবনার শেষ নেই। অসীম অনন্ত এ ভাবনা। এই ভাবনাই তার জীবন। এর শেষ মানেই মৃত্যু।

তার দেহের অস্থিমজ্জা, প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত তার অনুধ্যায়ী।

গৌরী তার রক্তের প্রথম ও শেষ গান।

না। সে থামতে পারবে না। থামতে চায় না। থামলেই তো শেষ হয়ে গেল। থামলেই আসবে ক্লান্তি। ক্লান্তিই মৃত্যু।

সে চলবে। অনন্তকাল ধরে চলবে। এই চলার মাঝেই তো জীবনের স্পন্দন। সাধনার সিদ্ধি।

গৌরীর বয়স বাড়ে।

কল্যাণের প্রেমের তরলতা গাঢ় ও গভীর হয়।

গৌরীর মৌনী কুমারী দেহে যৌবনের শঙ্খ বেজে ওঠে।

কল্যাণ দুচোখ ভরে দেখে সেই সৌন্দর্যের বিদ্যুদ্দীপ্তি। স্তবের ঘোরে লুটিয়ে পড়ে তার দেহমন। সে রূপের মাঝে দূর-দুর্গম পৃথিবীর আহ্বাণ। শুধু যৌবন সম্ভারে সে রূপময়ী নয়। রূপময়ী সে অন্তরের অন্তর্লোকে।

গৌরী ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো।

কল্যাণ আর বি, এ পরীক্ষা দিল না।

গৌরী একদিন দুম করে তাকে জিজ্ঞেস করে বসলো, এ বছরো যে পরীক্ষা দিলেন না?

গৌরীর কণ্ঠে অভিভাবকের ভর্ৎসনা। অধিকারের দাবি।

কল্যাণ চমকে গেল এবং লজ্জিতও হলো। সে কোন উত্তর দিলনা।

গৌরী রুক্ষ বিদ্রুপের কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, পরীক্ষা দেবার আর বাসনা নেই নাকি?

কল্যাণ হাসতে হাসতে তরল কণ্ঠে বললে, বেশ তো। তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে দেবো।

—অর্থাৎ ?

একটা অপমানের জ্বালায় গৌরীর চোখ দিয়ে কণা কণা আগুন ঠিকরে পড়লে।

কল্যাণ একেবারে মিইয়ে গেল।

গৌরী আগুনে গলায় ঝলসে উঠলো, আমি জানি। ঐ কথাটা বলবার জন্যে অনেকদিন থেকেই ছটফট করছিলেন। সুযোগ পাচ্ছিলেন না।

—কী কথা ? আমি তো তোমায় আঘাত করবার জন্যে অপমান সূচক কোন কথা বলিনি ?

থতমত খাওয়া জোলো গলায় উত্তর দিল কল্যাণ।

—আমি ফু-ল নই কল্যাণ বাবু। দুজনে একসঙ্গে বি-এ পরীক্ষা দেবা-র মানে বোঝবার মতো যথেষ্ঠ বয়স ও বুদ্ধি আমার হয়েছে।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে আরো ঋজু হয়ে নির্মম কঠোর গলায় গৌরী বললে, মনের হীন সত্যটা যখন মুখ দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখন আমার মনের সত্যটাও শুনে রাখুন। আপনাকে বিয়ে করা দূরে থাক আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্তরঙ্গ হবার বাসনাও কোনদিন আমার মনের কোণে উঁকি মারেনি। আপনার মনের গতি কারুর কাছে আর অজানা নেই। ইউ হ্যাভ বিন ফাউণ্ড আউট। আপনার বউদি এবং অন্যান্য অভিভাবকেরা বলে বেড়াচ্ছেন, আমিই নাকি আপনার মাথা খেয়ে দিয়েছি। আমার প্রেমে উন্মাদ হয়ে আপনি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছেন এবং পরীক্ষা দিচ্ছেন না। সে সব ডার্টি কথা নিজের মুখে ব্যক্ত করতেও আমি ঘৃণাবোধ করি।....

রাগে ও উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠেছে গৌরী। সে রাঙা আর্দ্র মুখখানা আঁচলে মুছতে মুছতে কম্পিত গলায় বললে, এর জন্যে যেন আমিই দায়ি। আমিই ঘটিয়েছি এই জঘন্য পরিস্থিতিটা।

কল্যাণ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, আমি তো সে-কথা বলিনি গৌরী! কেউ বলতে পারে না সে কথা।

—বলছে। আবার বলবে কি? নইলে মশায় পরীক্ষা দিলেন কি না দিলেন, আমার কিসের মাথাব্যথা? আপনার সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। যাক আমি এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না। দি লেস উই স্পিক অ্যাবাউট ইট দি বেটার।

কল্যাণ মুখ তুলে কি বলতে গেল, কিন্তু গৌরী অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে ঝাঁঝালো গলায় তাকে থামিয়ে দিল, প্লিজ। প্লিজ। আর দোষ-স্খালনের চেষ্টা করবেন না। আপনি ভদ্রসন্তান। একটা নিরীহ ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ের সুনামে কাদা মাটি মাখবেন না। এই আমার শেষ কথা।

—কী করলে তুমি সুখি হবে বলো। আমি তাই করবো।

দিনান্তের ক্লান্ত রশ্মিরেখার মতো করুণ চোখে তার পানে চাইলো কল্যাণ।

—কী করবেন বা কী করা উচিত নিজের শুভবুদ্ধিকে জিজ্ঞেস করবেন। আমাকে নিজের প্রেমিকা ভেবে রোমান্স করবেন না। আমাকে নিয়ে দয়া করে কাব্য সৃষ্টি বা সাহিত্য করবেন না। ফল হবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই ক্ষ্যাপার মতো যতোই কেন কেঁদে কেঁদে হাত বাড়ান না নাগাল কোনদিন পৌঁছবে না।

শরীরে একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ঢেউ তুলে আঁচল উড়িয়ে ক্ষিপ্র পায়ে চলে গেল গৌরী।

বিহ্বল বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কল্যাণ তার অপস্রিয়মান গতিভঙ্গির পানে।

অভিভাবক ও পরিজনদের গঞ্জনা শুনে শুনে কল্যাণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার নিরেট মনে কেউ আঁচড় কাটতেও পারেনি। কিন্তু গৌরী তার মনের সিমেন্ট জমানো দেয়ালে পেরেক পুঁতে দিয়ে গেছে। খানিকটা বালি-সিমেন্ট খসিয়ে দেয়ালটাকে দাগি করে রেখে গেল। মনে মনে হাসলো কল্যাণ। চোখে পড়বার মতো দাগ। চাপড়া খসে

গেছে। সর্ত হয়ে গেছে। গৌরীর হাতের দাগ। অনেকদিন দেখা চলবে। পেরেকটা ঠিক বসেনি। নড়বড় করছে। মুখটা বেঁকে গেছে। তা যাক, তবু ঐ পেরেকে গৌরীর ছবি ঝোলানো চলবে। ছবি দিয়ে পেরেকটা ঢেকে দেবে সে। পেরেকের খোঁচা ভুলবে ছবির পানে চেয়ে।

ছবি। আজকের এ ছবি তার স্মরণাগারে চিরদিনের মতো চিহ্নিত হয়ে রইলো। অপরূপ হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। রঙ? সকালের সোনালি রোদ তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল। হাওয়ার ভেসে বেড়াচ্ছিল তার দেহের কবোষ্ণ উত্তাপ। রক্তমাংসের দেহ তো সে নয়। সৌন্দর্যের ঈথর তরঙ্গ। একটা ভাব। একটা হাইপথেসিস। একটা আইডিয়া।

আর রাগ? রাগ তার সৌন্দর্যরাগের উপর আরেক পোঁচ তুলি বুলিয়ে দিয়ে তার অনুপ্রভা বাড়িয়ে দেয়। তার স্ত্রীময় সত্তাকে আলট্রা ভায়ালেট করে তোলে।

গৌরীর রাগ দেখবার সৌভাগ্য তো কল্যাণের হয়নি। মেয়েদের অনুরাগের চেয়ে রাগটা কল্পনা করা সহজ। কারণ রাগটা তাদের একটা সহজাত সম্পদ। প্রিয়জনের উপর রাগ তাদের জীবনের একটা বিলাস। রাগের আড়ালে তারা নিরাপদ। রাগের মাঝেই তাদের স্বাতন্ত্র্য। রাগ আর অভিমান নারী মনের গভীরে পাশাপাশি হাতধরাধরি করে বাস করে। ব্যাটারীর সেলের মতো। দুয়ে মিলে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। তাপ বিকীরণ করে। দাহ করে।

রাগ বিভীষণা। কিন্তু সেই ভয়-ভীষণ ভয়ঙ্করী রূপেরও একটা নতুনতরো সৌন্দর্য আছে। একটা বিধ্বংসী মাধুরী আছে। চণ্ডিকার ললাটেও চন্দ্রিকার ঢেউ খেলে যায়।

গৌরীর ক্রুদ্ধ রূপের মাঝেও লাবণ্যের লালিমা দেখেছে সে। তার দেহের বিদ্রোহের তীক্ষ্ণ রেখাগুলির মাঝেও একটা অপরূপ শ্রী প্রকাশ

পেয়েছিল। তার দাঁড়াবার কঠোর ভঙ্গিতেও একটা কোমল টান ছিল। প্রভাতের স্নিগ্ধতা ছিল।

কল্যাণ তার ধ্যানে গৌরীর নতুন রূপারোপ করল। ভুলে গেল গৌরীর অভিযোগের তীব্রতা। তার মুগ্ধ চিত্তের অনির্বান শিখায় আবার সে গৌরীর আরতি করতে বসলো।

রোমান্স যৌবনের রক্তপ্রবাহে। যৌবনের অস্থিমজ্জায়। অতি সংযমী এবং গোঁড়া পিউরিট্যানের ও এর হাতে নিস্তার নেই।

রোমান্স যৌবনের জীবন-পিপাসা। যৌবনের এপিডেমিক। তরুণ মাত্রেই নিজেকে রোমিও ভাবে। তরুণী ভাবে সে জুলিয়েট। এ একটা তারুণ্যের দুরারোগ্য ব্যাধি। এর ভ্যাকসিন নেই। এর কোন অ্যান্টিডোট নেই। এর হাতে কারুরি অব্যাহতি নেই। অন্তত একটি দিনও অতর্কিতে আক্রমণ করে তোমাকে এলোমেলো করে দিয়ে যাবে।

অমন যে গোঁড়া মুসলমান, অতিনৈষ্ঠিক সম্রাট ঔরংজেব তাঁরও জীবনে ছিল একটি মাত্র রোমান্স।

সে রোমান্সের নায়িকা এক অসামান্য সুন্দরী ক্রীতদাসী হীরাবাঈ।

হীরাবাঈ ছিল ঔরংজেবের মেসোমশায় মীর খলিলের রক্ষিতা।

হীরাবাঈ শুধু সৌন্দর্যময়ী ছিল না। ছিল নৃত্যগীতে তার অপূর্ব দক্ষতা। ছিল মধুরভাষিণী।

মীর খলিল তাকে বাঁদী থেকে নর্তকী পদে উন্নীত করে নাম দিয়েছিল জৈনাবাদী।

তরুণ ঔরংজেব তখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার।

ঔরংজেব বুরহানপুরে তার মাসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

তাপ্তি নদিতীরে, জৈনাবাদ উদ্যানে তরুণ ঔরংজেব প্রাতর্ভ্রমণ

করছিলেন। দৈবাৎ দৃষ্টিগোচর হলো বোরকা-বিরহিত এক অসামান্য সুন্দরী ফলভারে নত একটি আমগাছের শাখা ধরে পরমানন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে আম পাড়বার চেষ্টা করছে। শাখাটা প্রাণপণে টেনে ধরেও সে স্পর্শ করতে পারছে না আমটাকে।

সে খিল-খিল করে হাসছে আর নৃত্যের ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে। জানতেও পারেনি যে অন্তরালে যুবরাজ ঔরংজেব তাকে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে দেখছে।

তার রূপের অলৌকিক প্রভায় ঔরংজেবের চোখ ঝলসে গেছে। তার বুকের নিচে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কামনার উলঙ্গ ঝড়।

সম্মোহিত ঔরংজেব, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ঔরংজেব আচমকা পেছন থেকে তার কৃশ কটি বেষ্টন করে তাকে শূন্যে তুলে ধরলো।

জৈনাবাদী হাসির ঢেউ তুলে মৃদু আপত্তি জানালো।

—আগে আমটা পেড়ে নাও সুন্দরি—

আমটা ছিঁড়ে নিয়ে ভূমিতলে পদস্পর্শ করেই আনত কুর্ণিশের ভঙ্গিতে হীরাবাঈ বললে, শাহজাদা ?

—তোমার গোলাম। তোমার প্রণয় ভিখারী।

মধুবর্ষী জৈনাবাদীর নবনী-নমনীয় দেহের স্পর্শে ও কণ্ঠের ঝঙ্কারে ঔরংজেবের তরুণ রক্তে আগুন ধরে গেছে। দেবরাজ ইন্দ্রের মতো সহস্র নয়নের প্রেমার্দ্র পল্লবের ছায়ায় তাকে আচ্ছন্ন করে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কামনায় রাঙা হয়ে উঠেছে তার কর্ণমূল পর্যন্ত।

জৈনাবাদী ভীরু পাখির মতো মিহিস্বরে বললে, জনাব, আমি বাঁদী।

ঔরংজেব তার একখানা হাত চেপে ধরে নির্লজ্জ বশ্যতার ভঙ্গিতে উত্তর দিল, আমি বাঁদীর বান্দা হয়ে সেবা করবো। আমি তোমার শরণাগত। আমার পানে কৃপা দৃষ্টিতে চাও।

জৈনাবাদীর অধরে ফুটে উঠলো, মৃদু হাসি। সংশয়ের কুটিল হাসি।

কটাক্ষে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে বললে, তা হয়না শাহজাদা। আমি খলিল সাহেবের রক্ষিতা। খলিল আমার আশক। আমি তার সঙ্গে বেইমানী করতে পারবো না।

সম্মোহিত ঔরংজেব সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-বিনয় এমন কি সুন্দরী নর্তকীর পদতলে উপবিষ্ট হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলো এবং জৈনবাদীকে জয় করে গোপনে নিশীথ রাত্রে যুগলে বুরহানপুর ত্যাগ করে গেল।

দাম্ভিক ঔরংজেব, নির্মম ঔরংজেব, ক্ষমতা-গর্বী দিন দুনিয়ার মালেক শাহনশাহ ঔরংজেবকে রোমান্সের পিপাসায় এক গস্তানী নর্তকীর চরণতলে বসে প্রেমভিক্ষা করতে হয়েছিল।

শুধু তাই নয়। গোঁড়া মুসলমান ঔরংজেবের গোঁড়ামিকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিল নর্তকী জৈনাবাদী তার রূপের কুহকে।

আসলে ঔরংজেব তাকে ভালোবেসেছিল প্রাণমন দিয়ে। তার মুখে হাসি দেখবার জন্য তাকে অদেয় তার কিছুই ছিল না। তার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করবার মতো শক্তি তার ছিল না।

জৈনাবাদী তার ভালোবাসাকে পরীক্ষা করবার জন্য একদিন তাকে মদ্যপান করতে অনুরোধ করলো। যে মদকে ঔরংজেব হারাম ভাবতো সেই মদ্য-পূর্ণ ভৃঙ্গার জৈনাবাদীর আবদার রক্ষা করবার জন্য অবলীলায় ওষ্ঠাগ্রে তুলে ধরলো।

পানোদ্যত ঔরংজেবের হাত থেকে ভৃঙ্গারটা কেড়ে নিয়ে কুহকিনী জৈনাবাদী হাসতে হাসতে বললে, না। আমি শাহজাদাকে পাপে ডোবাতে চাই না। শুধু শাহজাদার ভালোবাসা পরীক্ষা করছিলাম।

এক সুন্দর প্রভাতে চোখ মেলতেই গৌরীর মনে হলো তার চারিপাশে ফুল ফুটেছে। মনের আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

গন্ধ-উতল অনুভূতি জুড়ে একটা মহোৎসবের মহাআয়োজন চলেছে। পৃথিবীকে তার রমণীয় মনে হলো। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত। পথের জন জটলাকে ছন্দহীন মনে হলো না। কোলাহল কলরবের মাঝে জীবনের মধুর সুর শুনতে পেলে। মনটা তার দাক্ষিণ্যে উদ্বেল। তার ভালোবাসতে ইচ্ছা করছে। নিজেকে বিলিয়ে দিতে মন চাইছে।

রোমান্সের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছে গৌরীর। অজান্তে তার ফাঁদে পা দিয়েছে। তার যৌবনের চোখে নতুন আলো জ্বলে উঠেছে। সে আলোয় বিশ্বের সকল সৌন্দর্য ঝলমল করে উঠেছে।

কৌমার্যের কৃষ্ণীভূত আকাশে চাঁদ উঠেছে। যৌবনের অসহিষ্ণু প্রতীক্ষার চাঁদ। অন্ধকারকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে চায়।

অন্ধকার মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মতো দূর থেকে ভেসে আসে কার আকুল আহ্বান। কৌমার্যের অকূল স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন দিগন্ত তাকে ডাক দেয়। সুদূরের পিপাসায় গৌরীর আকণ্ঠ শুকিয়ে যায়।

গৌরীর রোমান্সের রোমিও এক সুদর্শন তরুণ স্বর্ণকার। নাম অতুল। বৌবাজারে জুয়েলারীর দোকান।

অতুলের ফিটফাট সুন্দর চেহারার মতই মনোরম সাজানো তার দোকান। কাউন্টারের চারিদিকে বড়ো বড়ো ফ্রেমে আঁটা আয়না। শিলিং-এ আঁটা আয়না। শো-কেশের অষ্টেপৃষ্ঠে আয়না।

অতুলের পৈতৃক কারবার।

অতুল সম্প্রতি মা সরস্বতীর কাছে বিদায় নিয়ে মা লক্ষ্মীর আরাধনায় মনোনিবেশ করেছে। সরস্বতী তাকে কোল দেন নেই তাই লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হয়েছে। যুগের চলতি হাওয়ায় বিদ্যার চেয়ে বিত্তের গৌরব বেশী। চাণক্যের 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'র যুগ তো এ নয়।

অতুল প্রিয়দর্শন। সুন্দর তার মুখশ্রী। মেয়েলি ছাঁদের মুখ। দীর্ঘ পাতলা গড়ন। রঙ্‌টা অত্যন্ত ফর্সা। ঈষৎ পীতাভ। কালো

চঞ্চল চোখে প্রাণের আলো। নাকটা চমৎকার। যাকে বলে খগ নাসা। মুখের মধ্যে নাকটাই তার সবার আগে চোখে পড়ে। এক মাথা কালো ঝাঁকড়া চুল। সিনেমা তারকাদের মতো পরিপাটি অবিন্যস্ত। পরনে দিশী তাঁতের ফিনফিনে ধুতি। গায়ে শিল্কের পাঞ্জাবী। আবক্ষ উন্মুক্ত। গলার হীরের বোতাম কটা অযত্নে বোতামের ঘর থেকে বেরিয়ে বুকের উপর লটপট করছে। পায়ে বিনুনী করা চপ্পল।

গৌরী তার দিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে অতুলের দোকানে গিয়েছিল। দিদি তার দোকানে গয়ণা গড়ায়। জামাইবাবুর পরিচিত দোকান।

প্রথম দর্শনেই গৌরীর মনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। বাঃ! বেশ মিষ্টি চেহারা তো? কবি শেলীর মতো মেয়েলি আর চিত্তাকর্ষক চেহারা।

গৌরীর চোখের ভালো-লাগার সঙ্গে একটা অপরিসীম কৌতূহল জাগে তাকে চেনবার ও জানবার।

একগাল হেসে অতুল তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। জামাইবাবু অতুলের সঙ্গে গৌরীর পরিচয় করিয়ে দিল: তোমার বউ-দির কনিষ্ঠা। নাম শ্রীমতী গৌরী। বেথুনের বি-এ ক্লাসের ছাত্রী।

অতুল একটা অতি বিনয়ের অঙ্গভঙ্গি করে টেনে টেনে বললে, বাস্‌রে বাস! বউদির বোন আবার বি-এ ক্লাসের ছাত্রী? তবে তো আপনিই আজকের গেষ্ট-ইন্‌-চিফ্‌। আপনাকে তো খাতির করতে হয়। বসুন। বসুন।

একখানা গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে সসম্ভ্রমে সে পাশে সরে দাঁড়ালো।

গৌরী তেরছা চোখে তারপানে কটাক্ষ হেনে মাথা হেঁট করে বসলো।

গৌরী ব্লাউজের নিচে থেকে রুমাল বের করে আলতো করে কপালের ঘাম মুছলো। তার শরীর তেতে উঠেছে।

সৌজন্যের হাসি হাসতে হাসতে অতুল বললে, কী দিয়ে খাতির করবো বলুন? চা না কোল্ড ড্রিঙ্ক?

মুখরা গৌরী মুখ খুললো। সোজা মুখ তুলে বাঁকা হাসিতে ঠোঁট মুচড়ে বললে, খাতিরের মাশুলটা তো দিতে হবে জামাইবাবুকে?

জামাইবাবু হেসে উঠলো।

অতুল তার কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না। অপ্রতিভের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলে, তার মানে?

গৌরী কুটিল কটাক্ষ হেনে বললে, মানে বুঝেও যদি না-বোঝার ভান করেন বোঝাবো কেমন করে? মানে হচ্ছে যে এই খাতিরের খরচটাও তো দাদাবাবুর বিলে গিয়ে চাপবে?

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো।

অতুল গম্ভীর হয়ে বললে, ও-টা ট্রেড সিক্রেট হলেও ওপেন সিক্রেট। কথাটার মাঝে কিছুটা সত্যি আছে বই কি। ও খরচটা এস্টাবলিসমেণ্ট খাতার এলেকা এবং প্রত্যেক গ্রাহককেই সমানভাবে তার ভার বহন করতে হয়। তবে আপনার খাতিরের মাঝে ব্যবসার গন্ধ নেই। এ আমার হৃদয়ের আনন্দ নিবেদন। এ আমার অর্ঘ।

গৌরীর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো তার কথার ঝাঁজে। জামাইবাবু আর দিদি মুখ টিপে হাসলো।

গৌরী যে-দিকে চায় সেই দিকেই তার আরক্ত মুখের প্রতিবিম্ব। নিজেকে লুকোবার আড়াল খুঁজে পায় না। সে বিরক্ত হয়ে অতুলকে প্রশ্ন করলে, ঘরের সর্বাঙ্গে এতো আয়না এঁটেছেন কেন?

হেসে উঠলো অতুল। বললে, এক চাঁদ শত চাঁদ হয়ে দেখা দেবে বলে। আকাশের চাঁদের চেয়ে দীঘির কালো জলে চাঁদের মায়া বেশী।

দিদি হেসে উঠলো। দাদাবাবুও হাসলো। হাসলো তাদের অসংখ্য প্রতিবিম্বগুলো।

গৌরী ঠোঁট ফুলিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বললে, ইস! আবার কাব্যি আছে?

অতুল হেসে উঠলো সশব্দে। বললে, সুন্দরকে রূপ দেওয়া যদি কাব্য হয় তাহলে আমি কবি। আমরা রূপকার। সৌন্দর্যে রূপারোপ করাই আমার বৃত্তি। কবি আর শিল্পীর জাত এক। গোত্র এক। আমি জাত-শিল্পী।

গৌরী আনমনা হয়ে নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে আছে। সে মন দিয়ে কোন কিছু শুনতে পারছে না। তার চোখদুটো মনকে পেছনে ঠেলে এগিয়ে এসেছে। তার চোখ মনকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

ছেলেটা বাচাল কিন্তু ভারী সুন্দর!

গৌরীর মন বলে, তুমি রূপকার নও। তুমি রূপময়। তোমার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন তোমার ঐ দেহের মাঝে ঘুমিয়ে আছে। তোমার সৌন্দর্যের আঁচ লেগে অনেকে সুন্দরী হয়ে উঠবে।

অতুল দিদির পানে চেয়ে বললে, বোনের তো এখনো বিয়ে হয়নি দেখছি—

—কেন বিয়ের সম্বন্ধ করবে নাকি?

মাঝপথে বাধা দিল দিদি।

—না। না। আমি ঘটক নই। পরের বিয়ের সম্বন্ধ আমি করি না।

গৌরীর বুক কেঁপে উঠলো। কী জানি কি বলে বসে!

অতুল বললে, আমি বলছিলুম কি, ওঁর বিয়ের সময় আমায় স্মরণ করবেন। আমি ওঁকে সাজিয়ে দেবো। ওঁর গায়ে কোথায় কোন গয়না মানানসই হবে, ওর চেয়ে আমি ভালো জানি। আমার পছন্দমত

আমার দোকানের গয়না ওঁর এই সুন্দর দেহে উঠলে রূপ জ্বলে উঠবে। বরের মাথা ঘুরে যাবে।

গৌরী মুখ বেঁকিয়ে শাণিত কটাক্ষে তাকে শাসালো : সঙ!

মুখ বেঁকালে হবে কি, মনের যে তট ভাঙতে সুরু হয়েছে অতুলের হাসির আর রূপের তোড়ে। হাসি যেন শো-কেশের ভেতরের পালিশ-করা গয়নার মতো ঝকঝক করছে। চোখ ঝলসে দেয়। মর্ম্মমূলে কাঁপন ধরায়।

চলার পথে প্রাত্যহিক জীবনে পুরুষের এমন মোলায়েম কোমল রূপশ্রী তার কখনো নয়নগোচর হয়নি। সোনার ব্যবসা করে দিবারাত্র সোনার স্পর্শে ওর অঙ্গ হয়েছে সোনার বরণ। সর্বাঙ্গে সোনার গুঁড়ো মাখানো। চোখে সোনার ছিটে।

গৌরী অবাক হয়ে যায় নিজের চিত্তচাঞ্চল্যে। লজ্জিতও হয় মনে মনে। হবারি কথা। এ তো তার মতো নয়। তার মনের চেহারা নিরেট, খটখটে। তার জীবনযাত্রার পথ শক্ত মাটিতে তৈরী। অতি সংযত। কিছুটা নির্মম বলাও বলে। স্কুল কলেজে একা যাতায়াত করলেও তার জীবনে পুরুষ বন্ধুর জনতা ছিল না। সে ছিল আদর্শ ছাত্রী। ছাত্রী জীবনের কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন মেনে মেনে সে নিজের চারিপাশে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে রেখেছিল। বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ সৌন্দর্য সমারোহকে সে চেতনা দিয়ে ধরতে পারতো না। আজ যেন একটা প্রচণ্ড আলোড়নে সব এলোমেলো সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

একটা আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।

তার মনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে সুন্দর ছেলেটা। সুন্দর নিঃসন্দেহ। সুন্দরের দেবতার মতই সুন্দর। অস্থির। অশান্ত। অগোছালো। এই অস্থিরতাই তার সৌন্দর্যের মাধুর্য। এই চাঞ্চল্যই

তার দুর্বার প্রাণশক্তি। কথাবার্তায়ও তেমনি অনর্গল ও বেতাহাস। পুরুষের এই বেএক্তিয়ার, বেতাল ভাবটি মেয়েরা পছন্দ করে। মেয়েরা ভালোবাসে অশান্ত পুরুষ।

গৌরী ভাবে। সারারাত জেগে ভাবে। নিষুপ্ত রাত্রির অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে একজনকে ভাবার মাঝে যে এতো আনন্দ আর এতো রোমাঞ্চ সে এই জীবনে প্রথম অনুভব করলে। একটি নিটোল ঘুমের মতোই মধুর সেই অনুভূতি। মনে ফুল ফোটায়। দেহ গন্ধ-মন্দির হয়ে ওঠে। চোখ স্বপ্নাকুল হয়ে ওঠে।

বেশ লাগে।

সকালে উঠে নতুন পৃথিবীর সঙ্গে নতুন চোখে শুভদৃষ্টি হলো। এতোদিন অন্ধ হয়েছিল। সূর্যোদয়ের এতো গরিমা এতোদিন চোখে পড়েনি কেন? আকাশ থরথর করে কাঁপছে কনক সূর্যের প্রথম পদপাতে। অনাত্মীয়, অপরিচিত পুরুষের স্পর্শে কুমারী দেহ যেমন কাঁপতে থাকে ভীরু উত্তেজনায়। নতুন সূচনার আবেশে।

অতুলের মুহূর্তের স্পর্শে গৌরীর মনের রাঙা আকাশও কেঁপে উঠেছিল একটা মধুর উত্তেজনায়। অনির্বচনীয় পুলকে। দেহের রক্তের ঢেউ বোধ হয় মুখে উছলে পড়েছিল।

দোকানের দরজার কাছে বিদায় সম্ভাষন জানাবার অছিলায় অতুল তার হাতখানা চেপে ধরেছিল, শেক্-হ্যাণ্ড করার ভঙ্গিতে। হাতের তালুতে আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে কী যেন সঙ্কেত করেছিল। লতানে মেয়েলি হাতের কনক চাঁপা আঙুল। চোখের অতলে ফুটে উঠেছিল, একটা স্বপ্নাবেশের নেশা।

দোকানে তখন আলো জ্বলেছিল। সেই আলোক বন্যার নিচে তাকে দেখাচ্ছিল যেন কোন স্বপ্নলোকের মানুষ। স্বপ্নের ঘোরে চেয়ে আছে তার পানে।

গৌরীর কানে ছিল একজোড়া পুরোনো ইহুদী মাকড়ি। টোল-খাওয়া। বাঁকা।

অতুল সেটার পানে চেয়ে বলেছিল, কী পরেছেন এটা? খুলে ফেলুন। খুলে ফেলুন। বি-এ ক্লাশের ছাত্রী। কলেজে যান কেমন করে এই হুটো পরে? সে-হুটো খুলে একজোড়া মীনে করা ঝুমকো পরে এসেছিল কানে। চমৎকার গড়ন সে-হুটোর। অতুল বলেছিল: মুখের ঢেউ বদলে গেল। রূপ যাকে ভগবান দিয়েছেন সে রূপকে সজ্জা দিয়ে সম্মান দিতে হবে বইকি!

গৌরী সকালে উঠে আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঝুমকো পরা নিজের প্রতিবিম্বটাকে দেখলো।

গৌরী রূপসী। নিজের রূপের প্রশংসা অনেকের মুখেই সে শুনেছে। কিন্তু অতুলের মতো রূপময় পুরুষের মুখের প্রশংসা তাকে আত্মসচেতন করে তুলেছে। তার সার্টিফিকেটের দাম আছে বই কি!

হঠাৎ মনে পড়লো ঝুমকো হুটোর দাম দিতে হবে। পুরোনো মাকড়ির সোনার দাম বাদ দিয়ে বাকিটা দিতে হবে। অবিশ্যি আজই না দিলেও চলে, কিন্তু দিয়ে আসাই ভালো। কি দরকার? দিদির অ্যাকাউণ্ট আছে, তার সঙ্গে তো লেনদেন নেই।...আসলে ঐ ছুতো করে একবার দেখা করে আসা চলবে।

একটা রাস্তা খুঁজে পেয়ে মন তার আনন্দে পাখা মেলে দিল।

বাবাকে ঝুমকো হুটো দেখিয়ে পঁচিশটা টাকা চেয়ে নিল।

মা বললে, আর গায়ে কিছু দিয়ে না রাখলে এক সঙ্গে বিয়ের সময় দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বীণাকে বলবো গলার হারটা আর চুড়ি ক-গাছা ভেঙে গড়িয়ে দিতে। ওর স্যাকড়ার দোকানের গড়ন ভালো। নতুন নতুন ডিজাইন।

কলেজ যাবার সময় গৌরী নিজেকে ঘষে মেজে চকচকে করে তুললো। দেহে রূপসজ্জা দিয়ে পরিপাটি করে সে সাজলো। সাজলো সে বেণীদোলানো বেথুনের ছাত্রীর বেশে নয়। পুরুষের মনোমোহিনী লীলাসঙ্গিনীর বেশে। নব যৌবনের নির্বাক নিঃশব্দতাকে উচ্চারিত ও উচ্চকিত করে তুলে।

নিজের দেহের লালিত্য দেখে নিজেই মুগ্ধ হলো।

মনে মনে হাসলো গৌরী।

সে কি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে না কি? অতুলের সৌন্দর্যকে চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছে নাকি?

সে হেরে যাবে।

এতো সেজেও তার মনে হলো অতুলের সৌন্দর্যের কাছে এ কিছুই নয়। তার রূপের তুলনা হয় না। নিখুঁত তার দেহের গঠন। গৌরী কোথায় পাবে সে মুখ, সে চোখ, সে নাক। বাটালি দিয়ে কোঁদা গ্রীক মূর্তির মতই তার নাক ও মুখ।

ভাবের ঘোরে তার আকর্ণ রাঙা হয়ে উঠলো। তার রূপের ছটার উষ্ণ তাপ অনুভব করলো শরীরে। সমস্ত শরীর তেতে উঠলো। একটা প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায়, একটা নিবিড় তৃষ্ণায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে এলো! সে স্তব্ধতায় রাশীভূত হয়ে বসলো গিয়ে পাখার নিচে।

একটা নেশার ঘোরে সে কলেজে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার রূপসজ্জা দেখে মেয়েরা তাকে ছেঁকে ধরলো: ব্যাপার কি রে, কেউ দেখতে আসবে বুঝি?

তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই সে কৌতুক করে হাসিমুখে বললে, দেখাতে যাবো। আমাদের আর দেখতে আসবে কে, আমাদেরি বাড়ি বয়ে যেতে হবে।

—বরের বাড়ি?

—না। আমার দিদির বাড়ি। এখন গোলমাল করিসনি ভাই, পরে সব বলবো।

ভয়ঙ্কর নেশায় পেয়ে বসেছে গৌরীকে! যেতে পা ওঠে না। বুক কাঁপে দুর-দুর করে। লজ্জায় হাহাকার করে ওঠে তার অন্তরাত্মা। শিক্ষা ও সংস্কার পেছন থেকে তার আঁচল ধরে টানে। তবু তাকে যেতে হয়। একটা অদৃশ্য দানবিক শক্তি তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়। না গিয়ে তার উপায় কি?

আত্মতাড়না তাকে ভিতর থেকে গতি দেয়, তার অসাড় পঙ্গু মনকে সতেজ ও সবল করে তোলে, রঙিন আশায় উদ্দীপ্ত করে তোলে!

সে চলতে থাকে। নতুনের লোভে। নতুনের অন্বেষণে।

অতুলের সঙ্গে দেখা হতেই তার মনের ভয়েব ভাবটা কেটে যায়। ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে হাসির মৃদু রেখা।

অতুল তাকে একটি মধুর হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। গোপন কথা বলার মতো সকলের অগোচরে চাপা গলায় বলে, আমি জানতুম।

—কি জানতেন?

বিদ্যুৎ-চকিত দৃষ্টিতে তারপানে মুহূর্ত চেয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে মধুর মৃদুকণ্ঠে অতুল বললে, তুমি আসবে!

গৌরীর শরীরে রোমাঞ্চ জাগলো তার কণ্ঠের ছটায়, তার অন্তরঙ্গ 'তুমি' সম্বোধনে!

সে গম্ভীর হয়ে বললে, সে তো জানা কথা! না এসে উপায় কি? জিনিষ নিয়ে গেছি তার দাম দিতে আসতে হবে না?

নিঃশব্দে অতুল গৌরীর মুখপানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো অপলক কুটিল দৃষ্টিতে। যেন তার দৃষ্টির কষ্টিতে ঘষে তাকে যাচাই করে নিল।

গৌরী সে দৃষ্টির মত্ততা সইতে পারলো না। সে মাথা হেঁট করলো।

অতুল হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, কাল সারারাত ঘুমোতে পারো নি তো ?

কী সর্বনাশ ! গৌরী একেবারে ছাই হয়ে গেল ! তার হৃৎপিণ্ড মুচড়ে উঠলো।

ও কি যাতুকর ?

গৌরী কোন জবাব দেবার আগেই অতুল হাসতে হাসতে ফিস ফিস করে বললে, আমিও সারারাত চোখে পাতায় করিনি। রাত ভোর তোমায় ভেবেছি !

গৌরীর গা কেঁপে উঠলো। পা কেঁপে উঠলো। সে চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরে পাথর হয়ে গেল। অতুলের মনের চেহারাটা যেন হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে একটা ধূমহীন শ্বেতশুভ্র শিখার মতো জ্বলে উঠলো। কী যে বলবে বুঝে পেলে না।

একজন সরকার এসে অতুলের সামনে একখানা ক্যাশ মেমো ধরলো। মেমোটা সই করে দিয়ে অতুল উঠে দাঁড়ালো। গৌরীকে বললে, এসো !

গৌরী প্রশ্ন করলো না ! প্রতিবাদ করলো না ! নিঃশব্দে তার অনুসরণ করলো। জলের তোড়ে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মতো।

পেছনের একটা সিঁড়ি দিয়ে তারা উপরে উঠে গেল।

একটা বিরাট হলঘর। পায়রার খোঁপের মতো মাঝে মাঝে কাঠের পাটিশন করা। একপাশে ক-জন স্যাঁকড়া গয়না তৈরী করছে। আরেক পাশে পালিশ করা মেসিন।

যে ঘরে তাকে নিয়ে গেল অতুল সে ঘরখানা কোচ সেটি দিয়ে সাজানো। ঘরের এককোণে একটা ছোট শ্বেতপাথরের ডাইনিং

টেবিল। টেবিলের উপর কতকগুলো কাচের গ্লাস, চায়ের কাপ সসার এবং প্লেট।

এটা মালিকদের বিশ্রাম এবং টিফিন ঘর!

অতুল বললে, বসো! আমি খাবার আনতে বলি। আমার ভারি খিদে পেয়েছে। তুমি কি খাবে বলো?

—কিছু না!

—কেন, কলেজ থেকে আসছো, কিছু খাওনি তো?

গৌরী গলায় ভাষা পেলে না। সে স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতো চোখতুলে একবার তার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। নিবিড় অনুরাগ সে মুখের প্রতিটি রেখায়। সুন্দর দুটি চোখ! গভীর তৃপ্তিতে চোখদুটি হাসছে। তার চোখে চোখ রাখতে পারে না গৌরী! একটা দুর্বোধ্য উত্তেজনার সঙ্কোচে তার চোখের দীর্ঘ পাতা গুলো জড়িয়ে আসে। তার মর্মমূলে কাঁপন ধরে। তার অঙ্গ অবশ হয়ে আসে।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে সিগারেট ধরালো অতুল। গৌরীর দিকে কেশটা তুলে ধরে স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করলে, অভ্যেস আছে নাকি? গৌরী ভঙ্গিটাকে কঠিন করে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলো, ডোনচ বি ইনসোলেন্ট প্লিজ!

হেসে উঠলো অতুল: ক্ষেপছো কেন? তোমাকে অসম্মান করবার কথা আমি কল্পনা করতেও পারি না। আজকাল কলেজের মেয়েরা অনেকেই খাচ্ছে কিনা?

রোষদীপ্ত কটাক্ষ হেনে গৌরী প্রশ্ন করলে, সে-রকম অনেক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুতা আছে বুঝি?

হাসির তোড়ে একতাল ধোঁয়া ছড়িয়ে অতুল বললে, বন্ধুতা না থাকলেও দেখেছি অনেক। ব্যবসার দৌলতে অনেক কিছু দেখতে হয়। মেয়েদের সিগ্রেট খাওয়াটা অবিশ্যি আমি ও পছন্দ করি না।

আমার অতি আধুনিক মনেও কেমন বাড়াবাড়ি ঠেকে। থাকগে রাগ করো না। কিন্তু—

গলাটাকে খুব মধুর আর মোলায়েম করে মধুর হাসি হাসতে হাসতে বললে, রাগলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায় !

গৌরী তার পাতলা ঠোঁটের উপর সিগ্রেট ধরা আঙুল্ দুটির পানে চোখ মেলে দিয়েছিল ! টসটসে রসালো মেয়েলি ঠোঁট ! লিপ্‌ষ্টিক মাখবার ঠোঁট ! ঠোঁটের উপর অফুরন্ত হাসির আনাগোনা ! হঠাৎ তার মুখে আত্মপ্রশংসা শুনে গৌরী তার চোখে চোখ রেখে তাকালো। দুজনে দৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ হলো। এ ঘরের চারিপাশে আয়না নেই, তবু যেন গৌরীর মনে হলো অতুলের অসংখ্য ছায়া তার চোখের সামনে ভাসছে।

অতুল দৈবাৎ তার হাতের উপর একখানা হাত রেখে হাসতে হাসতে বিদ্রুপের কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তা হলে তুমি ঝুমকোর দাম দিতেই এসেছো না ?

গৌরীর মুখের রক্ত উবে গেল। ও যেন গৌরীকে চিনে ফেলেছে ! ওর চোখে ধরা পড়েছে তার লোভের চেহারাটা। সে কী যে বলবে, কী যে বলা উচিত ভেবে পেলে না।

আর একটা হাসির ঢেউ তুলে অতুল বলে উঠলো, এতো সেজেছো কেন ?

মা বসুমতী গৌরীকে লজ্জা আর অপমান থেকে রক্ষা করবার জন্য যেন তার আঁধার জঠরে টেনে নিচ্ছেন ! সে অন্ধকারের নিতলে নেমে যাচ্ছে মনে হলো। তার চোখ ফেটে জল এলো !

তার মনে হলো ঠিক হয়েছে। এ অপমান তো সে নিজেই আমন্ত্রণ করেছে। আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে একজন অপরিচিত পুরুষের নিভৃতিতে নিজেকে সমর্পণ করাই তো অপমানের একশেষ। শুধু অপমান নয়, স্বৈরাচার। অনুশোচনায় ও আত্মগ্লানিতে গৌরীর শ্বাসরোধ হয়ে এলো।

সে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। চোখে আগুন ছড়িয়ে বিদ্রূপ গাঢ় গলায় বললে, না আমি টাকা দিতে আসিনি। সেজে গুজে তোমার মনে সিঁদ দিতে এসেছি।

হেসে উঠলো অতুল। মুগ্ধ পুরুষ চিত্তের গভীর পরিতৃপ্তির হাসি! সে উঠে দাঁড়ালো। অবনমিত শ্রদ্ধার ভঙ্গি। পূজারী যেমন প্রতিমার সামনে দাঁড়ায়। পলকহীন চোখে তার ক্রোধরক্তিম মুখের পানে চেয়ে গাঢ় কম্পিত স্বরে বললে, এই রূপ প্রত্যক্ষ করবার লোভেই তোমাকে রুষ্ট করেছি দেবি! এই আমার ধ্যানের রূপ। এই রোষন রূপ ধ্যান করে কাল আমি নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়েছি। তোমার এই রূপ আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

গৌরী মুখ ঘুরিয়ে রুদ্ধ ভগ্ন স্বরে বললে, যথেষ্ঠ হয়েছে। ক্ষান্ত হন। আয়ত্বের মধ্যে পেয়ে তো অপমানের চূড়ান্ত করেছেন। আর কেন? আমায় দয়া করে যেতে দিন। চলুন, নিচে গিয়ে আপনার টাকা নিয়ে ক্যাশ মেমো দেবেন।

গৌরী দরজার দিকে ছু-পা এগিয়ে গেল। অতুল তার দিকে ছু-পা এগিয়ে গিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

আতঙ্কিত গৌরী বাতাসের মত স্বরহীন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো, সরুন্!

—না।

আরো কাছে সরে এলো অতুলঃ আমাকে 'তুমি' বলো! আমাকে 'সরুন' বলে দূরে ঠেলে দিয়ো না।

ছুজনে মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

ছুজনে চোখাচোখি হলো। ছুখানা বিদ্যুৎ ভরা মেঘ। গৌরীর চক্ষু পল্লবের গোড়ায় শিশির বিন্দুর মতো অশ্রু চিকচিক করছে! অতুলের মুখখানা মোমের মতো ফ্যাকাশে আর বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ ছুটো ধারালো ফলার মতো গৌরীর মুখের উপর বিঁধে

আছে। পলকহীন নিস্পন্দ চোখ। সাপের চোখের মতো সে চোখ প্রচণ্ড আকর্ষণ করে।

তার চোখে চোখ পড়তেই গৌরীর মুখের কাঠিন্য তরল হয়ে এলো। তার শরীর জুড়ে নেমে এলো একটা অলস তন্দ্রাবেশ। একটা ভঙ্গুর অবসাদ।

—আমি বন্য। আমি বর্বর। আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

বলতে বলতে দৈবাৎ সে নতজানু হয়ে গৌরীর পায়ের তলায় বসে পড়ল। গৌরী বিদ্যুত-তড়িতের মতো পা দুটো সরিয়ে নিতে গিয়ে পিছলে একখানা কোচের উপর বসে পড়ল। অতুল তার হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকলো।

সে কাঁদছে।

গৌরী কাঁপছে।

তার অশ্রুজলে গৌরীর কাপড় ভিজে যাচ্ছে। শুধুই কি কাপড় ভিজে যাচ্ছে না সেই অশ্রুজলে গৌরীর অন্তরের নিভৃতে প্রেমের মহাকাব্য রচনা হচ্ছে!

গৌরী বিমূঢ়, বিহ্বল, আত্মহারা! অতুলের স্পর্শের রোমাঞ্চে তার হৃদয় গলে যাচ্ছে! চোখের সামনে তার হাঁটুর উপর স্খলিত হয়ে পড়েছে চাঁদের একটা টুকরো। শরীরে তার পুঞ্জ পুঞ্জ চাঁদের সুষমা।

সে যেন গৌরী নয়। অলকাপুরীর রূপবতী রাজকন্যা! আর তার হাঁটুতে মুখ ঢেকে অশ্রুবিগলিত নয়নে তাকে প্রেমনিবেদন করছে স্বপ্নের দেশের রাজকুমার।

সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর গতি নেই। সময়হীন লোকের অবিচল স্তব্ধতায় গৌরী রুদ্ধশ্বাস।

হঠাৎ তার চমক ভেঙ্গে যায়। তার স্বপ্নের ঘোর যায় কেটে! সে অতুলের কালো রেশমের মতো, চুলের মাঝে হাত ডুবিয়ে ঝাঁকানি

দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরে অস্ফুট স্বরে বলে, যেমন মেয়েলি চুলের বাহার তেমনি মেয়েলি কান্না।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন গৌরী অতুলকে সঙ্গে নিয়ে দিদি বীণার বাড়িতে এসে হাজির। দিদিকে সরাসরি জানিয়ে দিল : আমরা বিয়ে করবো।

—সে কি রে?

কপালে চোখ তুলে বীণা মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

গৌরী মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললে, তুমি অমন আকাশ থেকে পড়লে তো চলবে না। তুমিই আমাদের সাহস। তুমি আর দাদাবাবু।

—কিন্তু তোর ব্যাপার কি? তুই কি অতুলকে আগে থেকে জানতিস চিনতিস না আমাদের সঙ্গে গিয়ে সে-দিন প্রথম আলাপ হলো।

সলজ্জ হাসিতে মুখভরে অতুল বললে, সেইদিনই আমাদের প্রথম পরিচয়।

বীণা গালে হাত দিয়ে বললে, মাগো, সে যে এখনো হপ্তা পেরোয় নি। তুই কি পাগল হয়েছিস গৌরী, তুই ওকে কতোটুকু জানিস, কতোটুকু চিনিস। যে দুম করে ওকে বিয়ে করবি বললি? বিয়ে কি একটা দুদণ্ডের ছেলেখেলা? সারা জীবনের কথা। এক হপ্তা আগে যাকে চোখে দেখিসনি, যার নাম জানতিস না, এই হপ্তার মধ্যে তার সঙ্গে এতো আলাপ প্রণয় হয়ে গেল যে একেবারে দুজনে হাত ধরাধরি করে এসে বললি, আমরা বিয়ে করবো।

অতুল হাসতে হাসতে বললে, এক হপ্তা কি কম সময় নাকি দিদিমনি? এক হপ্তায় পৃথিবী ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারে,

আর দু-টি মেয়ে পুরুষের ভালোবাসা জন্মাতে পারে না? কী যে বলেন আপনি? আপনিও দেখছি মা-ঠাকুমার মতো একেবারে ব্যাক-ডেটেড। ভুলে গেলে চলবে না যে এটা গতির যুগ। এটা এরোপ্লেনের যুগ। এক হপ্তায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসা চলে।

—ডেপোঁমো করোনা অতুল। একটা মেয়ের জীবনের কথা। এ নিয়ে চালাকি করা চলে না। কোন সাহসে তুমি ওর সঙ্গে এখানে এলে তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আর গৌরী যে লেখাপড়া শিখে এমন অধঃপাতে যাবে আমি ভাবতেই পারিনি।

বীণার দুচোখে অশ্রুর ধারা নামলো।

—তুমি রাগ করছো দিদি? কিন্তু কি করবো বলো। মন তো আমার হাত ধরা নয়। এই একহপ্তা আমি পাগলের মতো ছটফট করেছি আর মনের সঙ্গে লড়াই করেছি।

অশ্রুসিক্ত চোখে ঝলসে উঠলো বীণা: একটা বেজাতের ছেলের কী দেখে তুই ভুললি? ওকি তোর যোগ্য? কী আছে ওর?

অতুল বললে, সে কথা আমি ও-কে বহুবার বলেছি। কিন্তু ভালোবাসার চোখ অন্ধ। যোগ্য অযোগ্যতার প্রশ্ন অবান্তর।

—তুমি থামো। তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না। ভদ্রসন্তান হয়ে তুমি একটা নিরীহ মেয়ের এই সর্বনাশ করলে? আমার বাপের বংশে কালি দিলে?

গৌরী অপরাধীর ভঙ্গিতে বললে, ওকে কেন অপমান করছো দিদি? যদি দোষ হয়ে থাকে সে দোষ আমার। আমি তো কচি খুকি নই যে ও ফুসলে আমার মন ভোলাবে? যা করেছি চোখ খুলেই করেছি। সুস্থ মনেই করেছি। ওর মাঝে আমি সত্যের আলো দেখেছি। যে সত্য যুগে যুগে অনাদি কাল ধরে নারীকে পুরুষের শরণাগত করেছে। ওর অপরাধ কি?

বীণা ঠোঁট উলটে বিতৃষ্ণার ভ্রূকুটি করে শরীরে একটা তাচ্ছিল্যের ঢেউ তুললো।

গৌরীর রসনা প্রখর হয়ে উঠেছে। সে উত্তেজিত অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো, সংসারে নতুন পথে পা বাড়ালেই বিপদ তা আমি জানি। সে পথ সুগম ও নির্ভুল হলেও তোমরা পেছন থেকে আচল ধরে টানবে। কারণ সে-পথ অচেনা। অজানা। এখনো সমাজে স্বীকৃত হয়নি। হলেও সর্ব সাধারণ্যে এখনো প্রচলিত হয়নি। ভাগ্য সকলের জন্যে সমান পথ তৈরি করে দেয়নি। আমার ভাগ্য না-হয় আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে এই নতুনের পথে। পারলুম না না-হয় তোমাদের আবহমান কালের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসান দিতে, তাই বলে কি আমরা মিথ্যে হয়ে যাবো? মিথ্যে হয়ে যাবে দুটি তরুণ মনের এই অকপট অনুরাগ।

অভিভূতের মতো বীণা তার মুখের পানে স্থির অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। গৌরীর এই আকস্মিক ও বিস্ময়কর পরিবর্তনটা যেন তাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। বেদনার তীব্রতায় সে নিস্পন্দ হয়ে গেছে। সে ব্যাপারটাকে আনুপূর্বিক অনুধাবন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুতেই বুঝতে পারছে না, এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হলো? এর মাঝে কোন ছন্দ নেই, গৌরীর প্রচলিত জীবনের কোন সুর নেই। সৌষ্ঠব নেই। সৌম্য, সংযত, শান্ত মেয়েটা যেন রাতারাতি কামনায় বন্য ও প্রগলভ হয়ে উঠেছে। দেহের লালিত্য যেন লালসায় স্পষ্ট ও নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। মুখের কমনীয়তা কামনার রূঢ়তায় গেছে মুছে। তার মুখের পানে চাওয়া যায় না। বীণার চোখ ফেটে জল আসে।

গৌরী বললে, তুমি না-জানি ভাবছো এ কতো বড়ো নির্লজ্জতা, কিন্তু বুঝতেই পারছো নিরুপায় হয়ে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছে তোমাদের গঞ্জনা ও অপমান সহ্য

করবার। পায়ের নিচে যখন ভূমিকম্প হচ্ছে তখন লাজলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে মাঠে গিয়ে একটু ঠাঁই করে নিতে হবে বইকি! জীর্ণ সংস্কারের খোলস খসিয়ে ফেলে যদি অন্য চোখে এটাকে দেখবার চেষ্টা করতে দিদি—

গলার স্বরটা তরল ও বাষ্পার্দ্র হয়ে এলো গৌরীর। সে সহসা দুহাতে বীণার গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর মাথা রেখে করুণ কোমল কণ্ঠে বললে, তাহলে চোখে পড়তো আমাদের সত্যটা। মনকে ছোট করলে তো সে সত্যের পানে চোখ পড়বে না। অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারবে না। বাধাটা কোন খানে? আমাদের জাত আলাদা? এই নতুন সভ্যতার যুগেও জাতকুল বাঁচাবার জন্যে আমাদের কি সেই বুকচাপা এঁদো পথ ধরেই চলতে হবে? সামনের নতুন রাস্তা সেণ্ট্রাল এভেন্যুকে পাশ কাটিয়ে চলতে হবে আমাদের জব চার্ণকের আমলের ভৈরব বিশ্বাসের গলি কিংবা ডোমপাড়া দিয়ে?

হেসে ফেললো অতুল। ঠোঁট মুচকে হাসলো বীণা।

গৌরী বললে, হাসির কথা নয় এটা। ভাববার কথা। আমাদের চারিপাশে যা আছে তাই নাড়াচাড়া করেই আমাদের খুশি থাকতে হবে। নতুনের দিকে হাত বাড়ালেই ঘটবে নৈতিক অধঃপতন। এ তো স্বাধীন মনের পথ অবরোধ করা—

গৌরীকে থামতে হলো। ঘরের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে জামাইবাবু অভয়পদ।

অভয়ের মুখখানা পাংশু। বিবর্ণ। একটা ঝড়ের গতিবেগ যেন তাকে শূন্য থেকে ঘরের মাঝে আছড়ে ফেলে দিয়েছে এমনি তার মুখের ভাব। তার মুখের চেহারা দেখেই বীণার বুঝতে বাকি রইলো না যে শুভ সংবাদটা পথিমধ্যেই তার কর্ণগোচর হয়েছে এবং বীণাকে সংবাদটা ফলাও করে শোনাবার জন্যেই যেন সে সারাপথ হাওয়ায়

উড়ে এসেছে। কিন্তু প্রণয়ী যুগলকে, তার বাড়িতে সশরীরে উপস্থিত দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

ঘরখানা স্তব্ধতায় কঠিন হয়ে উঠলো।

গৌরী সভয়ে, সন্দিগ্ধ নয়নে তার মুখের পানে মুহূর্ত তাকালো। নিজেকে তার অবান্তর অপাঙক্তেয় মনে হলো। অভয় যেন এসেই তার সামনে দূরত্বের একটা নিরেট দেয়াল তুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধুর স্নেহের বন্ধনটিকে নিষ্ঠুর হয়ে নির্মম হাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। তার বুঝতে বাকি নেই যে এরা তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাকে আলাদা করে দিচ্ছে। তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তার স্নেহ-প্রবণ অন্তরটা একটা শূন্যতায় হাহাকার উঠলো।

গৌরী হঠাৎ মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে সামলে নিল। সে সোজা মুখ তুলে অভয়ের মুখের পানে চাইলো। তার দুর্বল ঠোঁটে ফুটে উঠলো শীর্ণ হাসির রেখা। সে চোখে ঝিলিক দিয়ে কৌতুকের স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, কিগো, ভয় করবো না অভয় দেবে ?

মুহূর্তে অভয়ের মেরুদণ্ড উদ্ধত হয়ে উঠলো। মনের রুদ্ধ আক্রোশটা যেন একটা নির্গমনের পথ পেয়ে নিতান্ত নির্মমভাবে বেরিয়ে এলো ঃ যথেষ্ট হয়েছে গৌরী। আমাদের রেহাই দাও। আমাদের একটি দিনের অনবধানতার ফলে আমাদের উপর যে জঘন্য দোষারোপ করা হয়েছে তারই লজ্জা ও অপমানে আমরা লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। আমাদের আবার বিব্রত করতে এখানে এসেছো কেন ?

বীণা ব্যাকুলস্বরে প্রশ্ন করলো ঃ আমাদের অপরাধ ?

অভয় তীক্ষ্ণ রূঢ়স্বরে উত্তর দিল, আমাদের অপরাধ আমরাই ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। তোমার বাবা-মা এবং আত্মীয় পরিজনরা ভাবছেন তলে তলে আমরা ওদের প্রেমের লীলায় দূতিগিরি করেছি। আমাদের প্রশ্রয়েই ব্যাপারটা এতোদূর এগোতে পেরেছে।

—ছি ছি !

গৌরী ও অতুলের পানে তীব্র কটাক্ষ হেনে বীণা মুখ ঘুরিয়ে নিল। ঘৃণায় তার ঠোঁটদুখানা কেঁপে কেঁপে উঠলো।

অভয় বললে, তোমার বাবা আমার মুখের ওপর স্পষ্ট বললেন, তুমি আর আমি অত্যধিক আদর দিয়ে ওকে বিগড়ে দিয়েছি। আমাদের প্রশ্রয় না পেলে এতোটা বাড়াবাড়ি করতে পারতো না।

—তুমি কী বললে?

—বলবো কী? ভদ্রলোক পাগলের মতো ছটফট করছেন। তাঁর মুখের পানে চাওয়া যায় না। জানোতো তাঁকে। ভেতরটা স্নেহে গলে গেলেও বাইরেটা ইস্পাতের মতো শক্ত।

বীণা সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এ কী কাজ করলি তুই গৌরী?

গৌরী এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মূর্তির মতো দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়েছিল। তার দুই-চোখে গাল বেয়ে দীর্ঘ দুটি অশ্রুর ধারা নেমেছে।

অতুল রাশীভূত হয়ে একপাশে বসেছিল। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যথিতস্বরে বললে, আমরা যাই চলো গৌরী। এঁদের বিব্রত করে লাভ কী?

গৌরী দু-পা এগিয়ে এসে বললে, চলো। তারপর হঠাৎ অভয়ের হাতদুটো ধরে ভগ্নস্বরে বললে, বাবার কথাটা একেবারে মিথ্যে নয় দাদাবাবু! আমাকে বিগড়ে না দিলেও তোমাদের দুজনের স্নেহ আমার জীবনকে উন্নত ও উন্মুখ করে তুলেছিল। সেই স্নেহের দাবি নিয়েই তোমাদের কাছে ছুটে এসেছিলাম। ওকে আনতে সাহস পেয়েছিলাম। মনে আশা ছিল আর কারুর সমর্থন না পেলেও তোমাদের সমর্থন পাবো। আমার অন্তরের সত্যকে ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখা আমার স্বভাব নয়। ভেবেছিলুম সেই সত্য তোমাদের অন্তত চোখে পড়বে।

একটু থেমে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আস্তে আস্তে বললে, না

পড়ুক। তাতে দুখ্যু নেই। গুরুজনদের অভিসম্পাত আশীর্বাদ হয়েই আমাদের জীবনে দেখা দেবে এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

গৌরী নিঃশব্দে নত হয়ে তাদের দুজনকে প্রণাম করলো। অতুলও তার দেখাদেখি তাদের প্রণাম করলো।

অভয় অতুলকে প্রশ্ন করল, তোমার বাবা-মা একে বউ বলে গ্রহণ করবে?

—জানি না। তবে মায়ের সম্মতি আমি পেয়েছি।

গৌরী বললে, নাই নিলেন ক্ষতি কি? যিনি আমাদের মনে আলো জ্বেলেছেন, তিনিই পথের নির্দেশ দিবেন।

দরজা থেকে বাইরে পা দিয়েই গৌরী চমকে উঠল। দরজার গ্যাসের আলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণ। আলগা গা। শুধু পা। গৌরীর উপস্থিতির গন্ধ পেয়েই যেন সে তাকে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরী মুহূর্ত তার পানে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। মনে হলো যেন কল্যাণের মুখে একফালি হাসি ফুটে উঠল। হাতদুটি যুক্ত করে কপালে ঠেকিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কারও করলো বুঝি বা।

গৌরীর মন তখন পৃথিবীর ও-পারে।

"মায়ে ছাড়ে, বাপে ছাড়ে, ছাড়ে সখাসখি"—সব ছেড়ে জানা থেকে অজানায় অভিসরণ-ই নারীজীবনের চরম পরিণতি। অপরিচিত অজানাকে সানন্দে বরণ করাই বিবাহের একমাত্র ব্যাখ্যা। অপরিচিতের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মেয়েরা যেন তৈরী হয়েই থাকে। তার শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র গঠনের মূলে ঐ একটি মাত্র লক্ষ্য, অজানার উপযুক্ত করে তাকে গড়ে তোলা। পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে দিয়েই তার

জীবনের আসল পরিচয় গড়ে ওঠে। জীবন-স্বপ্ন সার্থক হয়। বিস্মৃত কৌমার্য অতীতের দিগন্তরেখায় বিলীন হয়ে যায়। বাপ-মা, ভাই-বোন, সমস্ত পিতৃকুল-টাকে ছবির পাশে অবান্তর ছায়ার মতো মনে হয়। তাদের সঙ্গে স্নেহের বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। অনুরাগের আবেগ উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে আসে। ধীরে ধীরে নিজের অগোচরে তারা দূর আত্মীয়ের জনতায় মিশে যায়।

মেয়ে জীবনের সম্পূর্ণতা তো তার পিতৃকুলে নয়। স্বামীকুলে বা স্বামীর মাঝে। একটি মাত্র পুরুষ তার জীবনে বহুধায় প্রকাশিত। স্বামীকে আশ্রয় করেই তার প্রাত্যহিক জীবন।

গৌরীও সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতুলের হাত ধরে, অতুলকে সম্বল করে আদিম জীবনের পথে পা বাড়ালো। স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়ে পাপের পৃথিবীতে নেমে এলো। তবু তার পা টললো না। বুক কাঁপলো না। নিঃশঙ্কচিত্তে, নির্বিবাদে, পিছনের সমস্ত পথকে মুছে দিয়ে সে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল বিশাল জীবনের মুক্তি খুঁজতে। ভবিষ্যতের অনাবৃত শুভ্রতায়। পারলো না সে নিজের মনুষ্যত্বকে সামাজিকতার পাঁকে ডুবিয়ে দিতে। পারলো না লোক সংস্কারের ও লোকনিন্দার লজ্জায় সে আদিম প্রাণশক্তিকে খর্ব করতে। নিজের চিত্তের অখণ্ড স্বাধীনতাকে মাথা নত করতে দিল না তুচ্ছ অপবাদের ভয়ে। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখতে চাইল।

চিরদিন সে একরোখা। আর জেদী। এটা সে উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের কাছে পেয়েছিল! বাবা তার একান্ত জেদী ও একগুঁয়ে। তার গাম্ভীর্য দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের মতো। হালকা হাসি তার কাছে একটা বিলাস। একমাত্র গৌরীকেই তিনি হাসি বিতরণে কার্পণ্য করতেন না। গৌরী তাঁর বিশেষ প্রিয় ও অনুগত ছিল। বাপের সেবা ও লেখাপড়া ছাড়া সংসারে গৌরীর কোন কাজ ছিল না। কর্তব্য

ছিল না। গৌরী সেই স্নেহময় পিতার বুক ভেঙ্গে দিয়ে চিরদিনের মতো তার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। নিজের অন্তরের সত্যকে ধ্রুব ভেবেই সে অনিশ্চিতের অন্ধকারে ডুব দিল।

রেজেষ্ট্রী আপিসে তাদের বিয়ে হলো। বিয়েতে হাজির ছিল অতুলের কয়েকজন বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং গৌরীর ক'জন কলেজের সহপাঠিনী।

নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা ও আনন্দ উৎসবের জন্য অতুল একটা সম্ভ্রান্ত হোটেলে সান্ধভোজের ব্যবস্থা করেছিল।

বর কণে এবং নিমন্ত্রিতদের আনন্দোৎসবের মধ্যে একটি অপরিচিত কিশোর এসে গৌরীর হাতে দিল কাগজে প্যাক করা একটি বাক্স। কোন অনুপস্থিত বন্ধুর উপহার ভেবে গৌরী হাসিমুখে হাত পেতে বাক্সটি নিল। ছেলেটি আনত ভঙ্গিতে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাগজের মোড়কেব ভিতর একটি ভেলভেটের গয়নার বাক্স। বাক্সর ভিতর একজোড়া মিনে করা সোনার কঙ্কণ। সঙ্গে একখানি ছোট্ট চিঠি। চিঠিখানা পড়ে গৌরীর মুখখানা পাংশু ও বিবর্ণ হয়ে গেল।

কল্যাণের উপহার। কল্যাণের চিঠি।

স্নেহের গৌরী,

তোমার জীবনের আজ একটি শুভ ও স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে আমার অন্তরের শুভেচ্ছা ও প্রীতিউচ্ছ্বাস না জানিয়ে পারলুম না। ধৃষ্টতা মার্জনা করে দীনের এ উপহার গ্রহণ করো।

তোমার নির্ভীকতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। বিয়ে সত্য হয় প্রেমে। সেই প্রেম যদি সত্য হয় তোমাদের মিলন নিশ্চিত সার্থক হবে। জীবন হবে মধুময়।

ভগবানের কাছে একান্তমনে প্রার্থনা করি তোমার জীবনের নতুন সূচনা শুভ হোক, শুভ্র হোক, জ্যোতির্ময় হোক।

তোমার চির শুভানুধ্যায়ী

কল্যাণ

চিঠিখানা পড়তে পড়তে গৌরীর চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। সে চিঠিখানা অতুলের হাতে দিয়ে তরল অবশ গলায় বললে, দিদির পাশের বাড়িতে থাকে। আমি ভরসা করে ওকে বলতে পারিনি। ও আপনা থেকে তার তরুণ বলিষ্ঠ অন্তরের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তরুণ-দল আমাদের ধারক। তরুণদলের প্রতিভূ হয়ে কল্যাণবাবু আমাদের সমর্থন করেছে।

অতুল চিঠিখানা হাতে নিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কী যেন ভাবছে।

গৌরী আরক্ত মুখে তার পানে তাকাল।

অতুল বললে, আমি একটা কথা ভাবছি গৌরী, ভদ্রলোক না হয় শুভেচ্ছা জানালো কিন্তু হঠাৎ একটা এতো দামী গয়না উপহার দেবে কেন, তোমার সঙ্গে এমন কিছু ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা তো নেই।

গৌরী উৎসুক দৃষ্টি মেলে তার মুখের পানে চেয়ে বললে, তা নেই। তবে অনেক দিনের জানা চেনা। কেন, তোমার কি মনে হচ্ছে ?

—আমার মনে হচ্ছে, এটা দিদির কারচুপি নয়তো ? ওর বেনামিতে জিনিষটা পৌঁছে দেওয়া। ওদের মনের সঙ্গে তো মুখের কথার মিল নেই। যেমন আমার মা। মুখে দুশো গাল দিচ্ছে আমাকে আবার বাবাকে লুকিয়ে সিন্দুক খুলে তোমার জন্যে গয়না দিচ্ছে। বেনারসী শাড়ি কিনতে টাকা দিচ্ছে।

গৌরী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসতে হাসতে বললে, হতেও পারে। কিছুই বলা যায় না। আসলে ওদের আদিম স্বাধীন বৃত্তির

গলা চেপে ধরে আছে সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা, নইলে এত নিষ্ঠুর হতে পারতো না।

পরের দিন তারা সফরে বেরোলো মধুচন্দ্রিকা করতে।

গৌরীর তখন গ্রীষ্মের ছুটি।

অফুরন্ত অবসর। তারুণ্যের উন্মাদনা। রক্তের মাঝে উচ্ছল নদী-তরঙ্গ। চোখে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ কটাক্ষ। মুখে অফুরন্ত হাসির ছটা আর কথার মালা। উদার, উন্মুক্ত জীবন। মনের মেঘলা আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল। অবারিত। আর কোথাও কোন ছায়া নেই। নতুন পৃথিবীতে তারা নতুন মানুষ।

নতুন দেশের নতুন হাওয়া। নতুন আলো। নতুন পরিবেশ।

একটা উদভ্রান্ত গতিবেগ তাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে নতুন এক পৃথিবীতে। পুরোনো পৃথিবীর সব কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের চেতনা থেকে। সমর্পিত দেহ। নতুন স্পর্শের রোমাঞ্চ দেহতটে। নতুন ঢেউয়ের আনাগোনা। নিবিড় নিভৃতি। রাত্রির কুহক। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল। স্বল্প পরিসর বাসর শয্যা কামনা পূরণের বিস্তীর্ণ আঙিনা। কামনা বিরতির অলস আরাম। দুজনের মাঝে লাজুক নিঃশব্দতা। আচ্ছন্ন, অবশ দেহে একটি মধুর কাম্য অবসাদ। হৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহে একটি পরম পরিতৃপ্তির আবেশ। স্নায়ু-তন্ত্রীগুলোর মত্ততা থেমে যায়। অবচেতন অনুভূতি জুড়ে ঝঙ্কৃত হয় হয় দূরাগত শানাই-এর একটা মিলন মধুর রাগিণী। নিস্পন্দ নিথর দেহ ঘুমে কোমল হয়ে আসে। নতুন-তরো নিবিড় নিটোল ঘুম। শরীরের বৃন্তে যে ঘুম তৃপ্তির ফুল ফোটায়।

স্বপ্নের ঘোরে দিন কেটে যায়।

গৌরী তার জীবনে ছন্দ খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে চলবার মুক্ত পথ। পায়ে পেয়েছে চলবার অবাধ স্বাধীনতা। আর তার জীবনে কোন আড়াল নেই। কৌমার্যের কাতর সঙ্কোচ নেই। অতুল

তাকে নারীত্বে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। সে এখন অতুলের স্ত্রী। তার ভাবী সন্তানের জননী।

তার জীবনে এখন অগাধ বিস্তার। বিশাল ভবিষ্যৎ।

মনে নেই অনুস্মৃতির অনুশোচনা। প্রিয় পরিজনদের বিচ্ছেদের পরিবেদনা।

না ভুল সে করেনি। ভুলই যদি করে থাকে, ভুল করবার স্বাধীনতা দিয়েছে তাকে তার প্রেম। তার স্বামীর প্রেম। তাদের প্রেম যদি সত্য হয় কোন ভুলই ভুল নয়।

অতুলের প্রেমকে সত্য ভেবেই সে সব ছেড়েছে। সব ভুলেছে। তার বুক ভরে আছে অতুলের প্রেমে। অন্ধকার রাতের চঞ্চল নদী-জলের মতো তার শরীরের তটভূমিতে স্বামীপ্রেমের পূর্ণতায় টল টল করছে।

অনাদিকাল ধরে নারীর জগৎ পুরুষের পূজা পেয়ে এসেছে। পুরুষের জগৎ আজো নারীর রূপের মহিমা কীর্তন করছে। নারীকে পূজা দিচ্ছে। গৌরীও তার স্বামীর কাছে শুধু তার রূপ যৌবনের স্বীকৃতি পায়নি, পেয়েছে পূজা। তার প্রেমের পূজায় সে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। ধনীর সন্তান প্রেমের পদতলে নিজেকে বলি দিয়েছে। সুখৈশ্বর্য বিসর্জন দিয়েছে। স্নেহময় পিতার বিরাগভাজন হয়েছে!

তার জন্যও গৌরী কৃতজ্ঞ বই কি!

বউবাজারের মুখে সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুর উপর একটা বড় বাড়ির দোতলায় একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট। দু কামরার স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। সেইখানে গৌরী নীড় রচনা করলো। মনমতো করে সাজালো ঘর দু'খানিকে। একখানি শোবার আরেকখানি বসবার। এবং গৌরীর পড়বার।

সামনের বছর গৌরীর বি, এ পরীক্ষা। গৌরীর কলেজ খুলেছে। শাঁখা সিন্দুর পরে গৌরী পূর্বের মতোই কলেজ যাচ্ছে।

অতুল দোকানে যায়। দোকানের কাছেই তাদের ফ্ল্যাট।

গৌরীর বাবা যেমন সরাসরি 'ও মেয়ের মুখদর্শন করবো না'— বলে মেয়ের সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিলেন, অতুলের বাবা গৌরীকে বধূ বলে সংসারে ঠাঁই না দিলেও, ছেলেকে পূর্বের মতোই দোকানে বাহাল রাখলেন এবং বোধ হয় তলে তলে তুজনের ভরণপোষণের উপযোগী মাসোহারা বরাদ্দ করেও দিলেন! পরের মেয়েকে নিয়ে যাতে ছেলেকে পথে দাঁড়াতে না হয়।

গৌরীর বাবার বাইরেটা রুক্ষ উলঙ্গ পাহাড়ের মতোই রুদ্র। ভিতরে ঝরণার প্রবাহ থাকলেও বাইরে নেই শষ্পাবরণের শ্যামলতা। তাঁর চোখে এ অপরাধের ক্ষমা নেই। স্খালন নেই। অতুলের বাবার উগ্রতার মাঝেও একটা অন্তর্লীন কোমলতার টান আছে। তা ছাড়া ছেলের অপরাধের গুরুভার তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সন্তানের কৃতকর্মের দায়িত্বের কিছুটা অংশ পিতা-মাতাকে গ্রহণ করতে হবে বই-কি!

গৌরী ও অতুলের মনে আশা ছিল, সময়ের দূরত্ব একদিন এ ব্যবধানটা সরিয়ে দেবে। গৌরীকে তাদের পারিবারিক মর্যাদা দিয়ে সংসারে তুলে নেবে। গৌরীর তার জন্য অবশ্য মনে কোন আক্ষেপ উৎক্ষেপ ছিল না! একা স্বামীর প্রেমেই সে জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছিল। এই নীরব, নিরালা ছোট্ট ঘরটির মাঝেই সে জীবনে একটা বিশালতার স্বাদ পেয়েছিল। সারাদিনের তুচ্ছতার পর স্বামীর প্রেমের আশ্রয়ে সে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়ে রাত্রের গভীর নিঃশব্দতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই তো নারীজীবনের অমরত্ব।

যৌবনের মতোই অস্থির পায়ে সুখের দিনগুলি তর তর করে চলে যায়। সম্ভোগের জীবন আরো সঙ্কিপ্ত। আরো স্বল্পায়ু। প্রথম যৌবনের সম্ভোগেচ্ছা কোটালের বানের মতো একটা স্ফীতকায় তরঙ্গ বই তো নয়। মুহূর্তের একটা উত্তেজনা। উত্তেজনার অবসাদ আছে। ক্লান্তি আছে। সেই ক্লান্তিই উত্তেজনায় মুহূর্তগুলিকে ক্রমশ শান্ত ও স্বাভাবিক করে আনে। জলের তোড়ে পাথর ক্ষয়ে গোল হয়ে যায়। মানুষের রক্তমাংসের শরীর আর কতোদিন একটানা তীব্রতা সহ্য করবে? তীব্রতা স্তিমিত হয়ে আসে। সবটাই একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। প্রাত্যহিকতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে।

বছর ঘুরে গেল। দুটি প্রেমাসক্ত নরনারীর নিভৃত নিরালায় আরেকটি প্রাণীর আগমন অত্যাসন্ন হয়ে উঠলো। তার কচি পায়ের পদধ্বনি প্রখর হয়ে উঠলো। গৌরী আরক্ত মুখে স্বামীর পানে চেয়ে বলে, আর পরীক্ষা দেওয়া হলো না।

অতুল বলে, তার জন্যে আমাকে দায়ি করোনা যেন।

—তবে কে দায়ী?

অতুল হাসতে হাসতে বলে, ছেলে হলে আমি। মেয়ে হলে তুমি।

গৌরী তার বুকে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখ বোজে! তার চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুফোঁটা অশ্রু।

মাতৃত্বের আনন্দাশ্রু। প্রেমের পরিপূর্ণতম মুহূর্তে আত্মার আনন্দ স্পন্দন। তার শরীরের বৃন্তে প্রেমের ফুল ফুটেছে! স্ত্রীত্বের ঘোমটা খসিয়ে সে এখন মাতৃত্বে উচ্চারিত। তাদের প্রেমের বন্ধনে আর একটা নতুন গেরো পড়ল। অতুল আর শুধু তার স্বামী নয় তার সন্তানের পিতা। দুয়ে এক হয়ে সৃষ্টি করেছে। দুজনের মিলিত দেহের একটা টুকরো।

গৌরী এখন আর সেই কুমারী গৌরী নয়। বই বগলে বেণী দোলানো বেথুনের ছাত্রী গৌরী নয়। সে এখন নারী। সে এখন স্ত্রী।

সে এখন মা। তার পরিচয়ের পরিধি এখন বহু বিস্তৃত। তার ব্যক্তিত্বে একটা দৃপ্ত মর্যাদাবোধ। স্বামীর জীবনে এখন তার অসাধারণ মূল্য। তার অধিকার অবিচ্যুত। তার আধিপত্য অখণ্ড।

এ এক আশ্চর্যকর অদ্ভুত অনুভূতি। মেয়েদের এই প্রথম জননীত্বের অনুভূতি। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা আলোড়ন চলতে থাকে। একটা নেশার মতো। একটা বিষের প্রক্রিয়ার মতো। কখনো দুরন্ত শীতের কাঁপুনি। কখনো প্রখর উত্তাপে দেহ গলে যায়। অনুভবের উত্তাপ। একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা। একটা গভীর তৃপ্তি। নিজের মধ্যে নিজেকে সে আর খুঁজে পায়না। নিজেকে আর মানুষ মনে হয় না। সে যেন চাঁদ। সূর্যের আতপ্ত আলোয় গা মেলে দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। ভিতরে তার ফুল ফুটছে। সেই ফুল ফোটার শব্দ সে শুনতে পায় কান পেতে শোনে। সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করে। তার দেহের মেঘস্তর ভেদ করে উদয় হচ্ছে জ্যোতির্ময় শিশু সূর্য। তার দেহের দেয়ালে কে যেন দিবারাত্র সিঁদ কাটছে—হৃৎপিণ্ডের উপর সঞ্চরণশীল কচি পায়ের স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে। হৃদয় ভেঙ্গে পড়ছে। অস্থি গলে যাচ্ছে। তবু যেন দেহে একটা মধুর তপ্ত স্বাদ পাচ্ছে। শরীরেব সমস্ত রস নামছে বুকের মাঝে। বুক দুটো অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে। রসে ভরা পাকা ফলের মতো।

সারা শরীরে একটা তীব্র মধুর যন্ত্রণা।

যত দিন যায় শরীরে নেমে আসে একটা দুবহ মন্থরতা। অবশ, আচ্ছন্নের মতো একা ঘরে শুয়ে থাকে। একটা অজানা আতঙ্কে তার মেরুদণ্ড বেঁকে তেবড়ে যায়। কাছে একটা মেয়ে সঙ্গিনী নেই। কোন মেয়ের স্নেহস্পর্শ নেই। জীবনের আশ্বাস দেবার কেউ নেই।

মাকে মনে পড়ে। মাকে নিষ্ঠুর মনে হয়। স্বামীকুলেরও কেউ নেই তাকে অভয় দিতে। নিজেকে তার অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও অসহায়

মনে হয়। পৃথিবীর মাঝে থেকেও সে যেন পৃথিবীর বাইরে। স্বামী ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এই একাকীত্বের উপলব্ধি তার মনকে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত করে তোলে। একটা মর্মান্তিক বিচ্ছেদ বেদনা তাকে পীড়িত করে তোলে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও অসুস্থ মনে হয়।

তবু সে স্বামীকে কোন কথা জানাতে চায় না। সে কাছে এলেই সে তার মুখের পানে চেয়ে হাসে। হাসির ঝিলিক দিয়ে সে কাতরতার কুয়াশাটা চাপা দিতে চায়।

অতুল তাকে সান্ত্বনা দেয়। আশ্বাস দেয়।

গম্ভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে লেডি ডাফরিন হাসপাতালে তাদের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো।

আবার তাদের মুখে হাসি ফুটলো।

গৌরীর মনে হলো আবার সে নতুন করে জীবনে ফিরে এলো। ফিরে এলো মাতৃত্বে উত্তীর্ণ হয়ে।

সন্তানের কল্যাণ, সন্তানের দায়-দায়িত্ব নিয়েই মাতৃত্বের বন্যায় সে গা ভাসিয়ে দিল।

সংসার একটু বড়ো হয়েছে।

প্রথম সন্তান। নিজেদের সৃষ্টির পানে চেয়ে চেয়ে পিতামাতার মনে চমক লাগে। নারীজীবনের চরম পরিপূর্ণতার আস্বাদে গৌরী লীলা-চঞ্চল হয়ে ওঠে।

স্বামী আর সন্তান। এই নিয়েই তো নারীর চিরকালীন জগৎ। এর বাইরে তার পদক্ষেপ নেই। তার বিস্তার নেই। এরাই তার জীবনের পরম প্রেরণা ও একমাত্র সত্য।

সেই সত্যপথ ধরেই গৌরী চলেছিল একমনে।

হঠাৎ সে একদিন মাঝপথে থেমে গেল। নিজেই কি থেমে গেল, না ভাগ্য তার পথ আগলে দাঁড়ালো ?

অনেকেই চলতে চলতে পথের মাঝে চিরকালের মতো থেমে যায়। গৌরীও থেমে গেল।

সর্বনাশ যখন আসে, এক লহমায় আসে। আসে অতর্কিতে। আসে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে।

বাতাসী গৌরীকে বলে, দাদাবাবুর চাল বিগড়ে যাচ্ছে বউদি। এখন থেকে হুঁসিয়ার না হলে তুমি বিপদে পড়বে !

বাতাসী কাহারের মেয়ে। গৌরীর দাই। আগে ঠিকে কাজ করতো। এখন দিনরাত্তের মানুষ। মেয়েকে দেখাশুনা করে।

গৌরীর উপর বাতাসীর একটা মমতার ভাব আছে।

বাতাসীর চোখে পড়েছে অতুলের স্খলন।

বউবাজারের এক নামজাদা বাঈজি, নাম পোখরাজ। বাঈজি অতুলের উপর মোহ বিস্তার করছে। অতুল তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। দুতিন দিন বাতাসীর চোখে পড়েছে। বাতাসী সংশয়ে বিচলিত হয়ে উঠেছে। তবু সে বিশ্বাস করতে পারেনি।...গৌরীর মতো যার সুন্দরী স্ত্রী।...হয়তো দোকানের খদ্দের।

তা ছাড়া প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ। নিঃসংশয় না হয়ে প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস তার হয়নি। তাই সে এতোদিন চুপ করে ছিল। কিন্তু আজ সে এমন কিছু দেখেছে যাতে সে নিঃসংশয় হয়েছে। এবং গৌরীর জন্যে হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেছে। তাই সে আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলো না। গৌরীকে সাবধান করে দিল।

বাতাসী বলে, বাঈজি দাদাবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। বাঈজির লোভ দাদাবাবুর পয়সার ওপর নয়। দাদাবাবুর রূপের ওপর। দাদাবাবুর রূপ আর স্বাস্থ্য দেখে হারামজাদী মজেছে

পেশা করে ওর অরুচি হয়ে গেছে। এখন মহব্বত করবার শখ জেগেছে। দাদাবাবুর খুবসুরৎ শেহের দেখে মাগি মরেছে।

গৌরী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার বুকের ভিতরটা অজানা এক চেতনায় ধক ধক করছে।

বিশ্বাস করতে মন চায় না। অবিশ্বাস করবার ও কোন কারণ নেই বাতাসীকে। তাদের দু-জনকেই বাতাসী ভালবাসে।

বাতাসীর মনের ক্ষতটা তার চোখে পড়ে বই কি!

বাতাসী শুধু ব্যথিত হয়নি সে রীতিমত ভয় পেয়েছে। বাঈজী পোখরাজের রূপের কুহকে পড়লে অতুলের আর রক্ষা নেই। শহরের অভিজাত সম্প্রদায় এবং দেশ বিদেশের কত রাজা মহারাজা পতঙ্গের মতো তার রূপের আগুনে পুড়েছে। তার কৃপাদৃষ্টি এবং মুখের এক ঝলক হাসির জন্য অকাতরে অজস্র ঐশ্বর্য তার রূপের পায়ের তলায় সমর্পণ করেছে। প্রাণহীনা, হৃদয়হীনা বাঈজী তাদের লুণ্ঠন করেছে হাসিমুখে। কারুকে প্রাণ দেয় নি। প্রেম দেয় নি। তার দুর্গম অজেয় হৃদয় দুর্গে কারুকে প্রবেশাধিকার দেয়নি।

নৃত্যগীত আর রূপকে বেসাতি করেই তার দিন কেটেছে। দেহের আয়নায় নিজেকে দেখেই সে যৌবনের তরঙ্গ কাটিয়েছে। মনের আয়নায় সে এতোদিন মুখ দেখেনি। হয়তো অবকাশ হয়নি।

দৈবাৎ অতুলের সঙ্গে পোখরাজের শুভদৃষ্টি হয় সেই আয়না ঘেরা দোকানঘরে, যেখানে গৌরী তাকে দেখেছিল প্রথমদিন। সেই আয়নার আবেষ্টনে বাঈজি পোখরাজ তার ব্যবসা বুদ্ধির সকল শাসন বহির্ভূত প্রেমপ্রশ্রয়িনী মূঢ় নারীমনকে প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। সে মন কোন যুক্তি মানে না। মোহ মানে।

সব ওলোট পালোট হয়ে গেল বাঈজীর। জহরৎ খরিদ করতে গিয়ে জহর খেয়ে ফিরে এলো। একশো টাকার জিনিষ কিনতে গিয়ে দুহাজার টাকার জিনিষ কিনলো। অতুলকে গাড়ীতে পাশে বসিয়ে

বাড়ি নিয়ে গেল বাকি টাকা দেবার জন্য। অতুলকে খাতির করে বসিয়ে তার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ জমালো।

গহনার সঙ্গে অতুলকেও সে খরিদ করলো।

বাঈজির প্রকৃতিগত ছলাকলা, মধুর হাবভাব, কুটিল কটাক্ষের সঙ্গে যদি কিছুটা অকপট প্রাণের আবেদন নিবেদন থাকে তাহলে আর রক্ষা আছে! সে ত্রিলোক জয় করতে পারে। অতুল কোন ছার।

অপ্সরীদের ছলাকলা সেকালে মুনিঋষির তপোভঙ্গ করতো। ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দিতো। বাঈজীর প্রভাবে অতুল যে গৌরীকে ভুলে যাবে, এ আর আশ্চর্য কী?

কিন্তু গৌরীর কাছে আশ্চর্য বই কি!

গৌরী তা হলে এতদিনে পেলো কী? এই দুঃখ দুর্দশার দুর্গম পথ পেরিয়ে কোথায় এসে উঠলো সে? কোথায় তার তীর্থমন্দির? কোথায় তার স্বপ্নলোক?

যাকে বিশ্বাস করে, যার হাত ধরে সংসার, আত্মীয় স্বজন, মা বাপ, ভুলে, সব ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো, বিচিত্র স্বপ্ন এঁকে চোখে, সে তাকে এই পথের অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে নিঃশব্দে সরে যাবে? তার এই বুকভরা ভালোবাসা ওর একটা খেয়ালের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে? গৌরীর মাটিতে পা বসে গেছে। সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে জীবনের মধ্যে বেঁচে নেই, অথচ মৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে যায় নি।

তবু তার বিশ্বাস করতে মন ওঠেনা।

অবিশ্বাস্য মনে হয়।

বাতাসী বলে, ভগবান করুক, মিথ্যেই হোক। তবু তুমি ভেতরে ভেতরে রাশ টেনে ধরো। হুঁশিয়ার হও। এতো রাত অবধি বাইরে থাকতে দাও কেন?

গৌরী নিস্পন্দের মতো বাতাসীর মুখের পানে চেয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। মুখ ফুটে তার সঙ্গে এ-সব আলোচনা করতে লজ্জায়

মাথা কাটা যায়। কি যেন ভাবে সে। মনে মনে যেন একটা মতলব আঁটে।

রাত্রে অতুলকে দেখে গৌরীর মনে হয় তার মুখ থেকে মুখোস খসে পড়েছে। সে যেন নতুন মানুষ। খোলস খসিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা পিছল আঁকাবাঁকা সাপ। তার মাঝে কোন সৌন্দর্য নেই। কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অতি সাধারণ, নগণ্য একজন মানুষ। সংযম নেই, স্বাধীনতা নেই। চরিত্রবল নেই। প্রবৃত্তির দাস।

দুর্বল কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে অতুল মেয়েটাকে আদর করে।

গৌরী নেপথ্য থেকে তারপানে চেয়ে চেয়ে দেখে। অশরীরী আতঙ্কিত চোখে। ম্লানায়মান আলোয় অতুলের মুখের পানে চেয়ে তার মনে হলো একটা বিশ্রী বিবর্ণ ক্ষুধা যেন সেই মুখের প্রতিটি রেখায় জ্বল জ্বল করছে। তার হাসিতে নেই প্রাণের ক্ষুদ্রতম স্পর্শটি। যেন অন্য বাড়ির লোক এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। তার দীপ্তি গেছে নিভে। কথা গেছে ফুরিয়ে। সে যেন তার অস্তিত্ব থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। সে যেন আর অতুলকে চিনতে পারছে না। সর্বাঙ্গে আহত ও বিধ্বস্ত হয়ে দেয়ালের গায়ে একটা ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে তাকে দেখে। দেয়ালটাকে আশ্রয় করে। পাছে কম্পিত পাদুটো দেহের ভার সইতে অক্ষম হয়।

গৌরীর বুঝতে বাকি নেই যে অতুলের জীবনের সুর গেছে বদলে। তার মাঝে তার জন্য আর কোন কবিতা নেই। সূক্ষ্ম কোন অনুরাগ নেই। যা আছে তা বৈচিত্র্য-বিহীন মানুষের স্থূলতম প্রবৃত্তি। সে যেন অন্য জগতের মানুষ। চেষ্টা করেও তাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সহ্য করতে পারে না তাদের উপস্থিতির ঘনতা। বাইরে যাবার জন্য সে ছটফট করে।

না। গৌরী তাকে ধরে রাখতে চায় না। তাকে সে বাধা

দেবে না। কৈফিয়ৎ চাইবে না। ভালোবাসা হারিয়ে তাকে নিয়ে সে করবে কি? তার ভালোবাসাকে যে কোন সম্মান দিল না, প্রবঞ্চনা করলো, শঠতা করলো, পদদলিত করলো তার জীবনের একমাত্র সত্যকে, তাকে সে ধরে রাখবে কি দিয়ে? কিসের লোভে?

তার চেয়ে যে মৃত্যু ভালো।

গৌরীর মুখে একটা পীড়িত, বিধ্বস্ত বিবর্ণতা। বেদনায় পাণ্ডুর। গতি স্তব্ধ। নিজের অজ্ঞাতে কখন দুই চোখে নেমেছে জলের ধারা। পাষাণে উৎকীর্ণ বেদনার প্রতিমূর্ত্তির মতো সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো না ক্ষীণতম প্রতিবাদ। তার শরীরে ফুটলো না বিদ্রোহের শীর্ণতম রেখাটি।

অতুল বলে গেছে রাত্রে সে আজ বাড়ি ফিরবে না। একটা বিয়ের গয়না ডেলিভারী দিতে যাবে মেদিনীপুরে। রাত্রে ফিরে আসা সম্ভবপর হবে না।

অতুলের বলার আড়ষ্ঠ ভঙ্গিমায় ও কণ্ঠের জড়তায় গৌরীর বুঝতে বাকি রইলো না যে কথাটা সত্যি নয়। তার স্বরের কুটিলতায় গৌরীর দেহ ঋজু বহ্নিশিখার মতো লেলিহান হয়ে উঠলো। তবু সে প্রশ্ন করলে না। আনমনে একটু দূরে সরে গিয়ে শুকনো দুটি ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়ে তুললে।

গৌরী সন্ধ্যের পর বাতাসীকে বললো খবর নিতে।

বাতাসী মুখ বেঁকিয়ে বললে, খবর আর নিতে হবে না। খবর আমার জানা আছে। বাঈজির বাড়িতে আমার আপনার জন আছে। তার কাছে আমি সব খবর পাই। বাঈজী দাদাবাবুর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। দাদাবাবুর পেছনে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছে। তাকে নিয়ে বাইরে সফর করতে যাবার জন্যে কাল দশহাজার টাকা

দিয়ে একখানা নতুন ঝকঝকে মটর গাড়ি কিনেছে। আমি আজ নিজের চোখে দেখে এসেছি।

গৌরী প্রশ্নাকুল চোখে তারপানে চেয়ে রইলো। বাতাসীর সমাচার তার মুখের সমস্ত আর্দ্রতা শুষে নিয়েছে। নীরেট, নীরস সাদা পাথরের মতো মুখখানা খটখট করছে। চোখ দুটো দপদপ করছে আগুনে কয়লার মতো।

বাতাসী তার চেহারা দেখে ভয় পেলো। সে তার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললে, ও নিয়ে মাথা গরম করো না বউদিদি। পুরুষের দশা-ই ওই। ওদের ক্ষিদেটাও বেশী আর নতুন নতুন খাবারের ওপর ঝোঁক ওদের চিরকাল। যাক না দিনকতক হাওয়া বদলে মুখ বদলে আসুক। কদিনই বা? তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

গৌরী নিঃশব্দে খোলা জানালা পেরিয়ে ছোট ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। বোধ হয় অশ্রু রোধ করবার জন্য। বাঁকা মেরুদণ্ডকে সোজা করবার জন্য।

নিচে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনু। পথ নয় জনসমুদ্র। গাড়ির জটলা। অস্থির গতিবেগ। পথের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো। কী দেখলো সেই জানে। তবে সঙ্কীর্ণ একটা পরিচয়ের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সে ও যেন ঐ জনসমুদ্রের অবিশ্রান্ত ঢেউয়ে মিশে গেল। পেলো একটা অবারিত মুক্তির স্বাদ। একটা চঞ্চল গতিবেগ। চলার মাঝেই জীবন।

প্রেম একটা দুঃস্বপ্ন। পৃথিবীতে প্রেম নেই। প্রেমের সততা নেই। শারীরিক সম্ভোগকে শ্লাল ও সুরুচি সম্মত করবার জন্যই প্রেমের আবহ সৃষ্টি। নইলে প্রেমের কোন অর্থ নেই। সংজ্ঞা নেই। কোন মূল্য নেই। নারীপুরুষের মিলনের মাঝে কোন শুচিতা নেই। পরিচ্ছন্নতা নেই। সবটাই প্রচ্ছন্ন আর ঘোলাটে। সবটাই একটা উদ্ভট উন্মাদনা। সবটাই সেই বর্বরযুগের আদিম ক্ষুধা।

আশ্চর্য মনে হয় গৌরীর। এ অসম্ভব সম্ভব হলো কেমন করে

তাই ভেবে গৌরীর আশ্চর্য লাগে। মানুষের মন বলে কোন কিছু নেই। চক্রান্তের দাসত্ব করা ছাড়া মনের কোন স্বকীয়তা নেই। স্বাধীনতা নেই। তার আনন্দ-বেদনার কোন নিরীখ নেই। কোন কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। সুখ নেই। কোন কিছু দিয়েই তাকে আপন করা যায় না। বিশেষ করে আনন্দের সামগ্রীকে। কিছুতেই তাকে ধরে রাখা যায় না।...

গৌরী তার নিজের মনের পানে পিছু ফিরে চায়। তাকে ও ধরে রাখতে পারেনি তার পরমাত্মীয়েরা। বাপ-মা ভাই বোন। তাদের বুকে শেল হেনে ঐ একটি লোকের হাত ধরে সে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই লোক তাকে আজ পথে দাঁড় করিয়ে নির্বিচারে সরে যাচ্ছে। পুরোনো শৃঙ্খল ভেঙ্গে নতুন শৃঙ্খল পড়তে চলেছে। পুরোনোতে আর স্বাদ নেই। অরুচি হয়ে গেছে।

গৌরীর মনে হয় পায়ের নীচে তার মাটি নেই। মাথার উপর আকাশের আচ্ছাদন নেই। একটা নিরবলম্ব ছায়ার মতো সে শূন্যে দুলছে। তার বুকের নিচে একটা বাষ্পের জোয়ার ওঠে।

কান্না নয়, বিচ্ছেদ বেদনা নয়,—একটা মর্মান্তিক অপমানের রুদ্ধ আর্তনাদ থেকে থেকে তার হৃদপিণ্ডে বেজে উঠছে। তার প্রেম অপমানিত। ধূল্যবলুণ্ঠিত। অপদস্থ। তার জীবনের প্রথম প্রেম। যে প্রেমের পূজায় নিজেকে সে বলি দিয়েছে।

আষাঢ়ের মসীলিপ্ত আকাশ ভেঙ্গে অঝোর ধারে বৃষ্টি নেমেছে। পথ ফাঁকা হয়ে এসেছে। বর্ষা-উতল রাত উঠেছে ঘন হয়ে।

বৃষ্টিধারার নিচে মাথা পেতে পথের আলোগুলো ঘোলা আর ঝাপসা হয়ে গেছে।

গৌরী নিঃশব্দে বাড়ি থেকে কখন পথে এসে নেমেছে।

বাতাসী জানতে পারেনি।

মেয়েকে কাছে নিয়ে অকাতরে সে ঘুমুচ্ছে।

উদভ্রান্তের মতো পথের পানে চেয়ে দেখে গৌরী।

পথ তার মুখস্থ।

সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু পার হয়ে সে সোজা বউবাজারের চৌমাথায় এসে দাঁড়ালো।

দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেছে। দু-একটা পানের দোকান খোলা।

এখান থেকে পশ্চিমে লালবাজারের দিকে তাকে যেতে হবে।

তাকে চেনবার উপায় নেই।

খুব কাছে না এলে কেউ তাকে মেয়ে বলেই চিনতে পারবে না। গায়ে দিয়েছে লম্বা একটা রেন কোট। মুখ-ঘেরা মাথায় বর্ষাতি টুপি।

দূর থেকে চিনবে কেমন করে ?

গৌরী পথ বেয়ে চলেছে। ধীর পায়ে।

মাথার উপর অঝোর বৃষ্টি ধারা। মুখে চোখে বৃষ্টির ঝাপটা। বুকের নিচে সাইক্লোনের আবর্ত।

তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সে নিজেই জানে না। পৃথিবীর মাঝে থেকেও সে যেন পৃথিবীর বাইরে।

সে কি নিজেই যাচ্ছে ? না পথ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ? টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার অবহেলিত, অপমানিত আত্মাকে ? তার নারীত্বের সমস্ত শুচিতা ও শুভ্রতাকে ?

একটা পাগলামিতে পেয়ে বসেছে তাকে।

হাঁ। পাগলামি বই কি !

তার বিয়ের মতোই পাগলামি।

দৈবাৎ তার মনে হলো, তার জীবনে প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব

আর তার বিয়ে দুটোই নিছক পাগলামি। শুধু পাগলামি নয় নিজের জীবনের সব চেয়ে বড়ো সর্বনাশ। সমস্ত টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোকে একত্র করে তার মনে হলো এর আগাগোড়া একটা দৈবের চক্রান্ত। তার জীবনের সব চেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। সব চেয়ে বড়ো লজ্জা। চরম পরাজয়। নিজের যে-প্রেমকে সে বড়ো ভেবেছিল, যে বিবাহকে জীবনের সব চেয়ে বড়ো শুভ ঘটনা বলে গণ্য করেছিল, আজ তাকে পরিহাস বলে মনে হলো। মনে হলো এ তার অকালমৃত্যু। তার প্রেমের অপঘাত।

সে নিজেকে ফাঁকি দিয়েছে। নিজেকে নিয়ে জুয়া খেলেছে। সাত পাঁচ, আগু-পিছু না ভেবে, কারুর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে, প্রিয়জনের প্রতিবাদের ঝড়তুফান কে গ্রাহ্য না করে, জীবনের উচ্ছলিত প্রেমযমুনায় যৌবনের দুরন্ত বাতাসের মুখে পাল তুলে দিয়ে যাকে কাণ্ডারী করে তরী ভাসিয়েছিল, সে যে তাকে মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি করবে তা সে ভাবে নি।

ভাববে কেমন করে ?

যে জীবন পণ করে তুফানের মুখে হাল ধরে নৌকো ভাসিয়েছিল, সে যে এতো শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে অন্য তীরের আশ্রয় খুঁজবে সে ভাববে কেমন করে ?

আসলে তার মনে প্রেম ছিল না। প্রেমের জৌলুষ ছিল। খাঁটি ধাতু ছিল না।

যার মুখের পানে চেয়ে, যার কথা ভেবে, অসহ্য আনন্দে তার মনের আকাশ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো, মনে ফুল ফুটতো—তার কথা ভাবতে মন তার ঘৃণায় রীরী করে উঠলো। তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল।

এ-ও তার অদৃষ্টে ছিল।

নিজের চোখে নিজের প্রেমের সমাধি দেখতে যাচ্ছে সে। এর আগে তার মৃত্যু হলো না কেন ? পৃথিবী রসাতলে গেল না কেন ?

এ কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল যে তার নির্মম বিধাতা এমনি অকরুণ হয়ে তার তিলে তিলে গড়া হৃদয় সৌধকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে ?

এমন কী পাপ করেছে সে ?

ভালোবাসা কী পাপ ?

মানুষকে বিশ্বাস করা পাপ ?

অনাদিকাল থেকে তো নারী পুরুষের মাঝে প্রেমের দেবতাকে খুঁজেছে। পুরুষের হাত ধরে স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়ে মর্তের মাটিতে নেমে দুয়ে মিলে শান্তি নীড় রচনা করেছে। মর্তের কঠিন মাটিতে ফুল ফুটিয়েছে।

বিশ্বাস না করে উপায় কী ?

এখনো যে তার অবিশ্বাস করতে মন ওঠে না।

সে নিঃসংশয় হতে চায়। কোন কিছু করবার আগে সে একবার নিজের চোখে দেখে নিঃসংশয় হতে চায়।

সে দাঁতে দাঁত চেপে বৃষ্টি-ভেজা পথে ছপ ছপ করে এগিয়ে চললো। নতুন পৃথিবীতে পা বাড়াবার আগে সে যেন পুরোনো পৃথিবীর কাছে বিদায় নিতে চলেছে।

না, তার মনে আর কোন ক্ষমা নেই, ক্ষোভ নেই, অনুতাপ নেই। গৌরী সেই জাতের মেয়ে যারা সহজেই ভাগ্যকে মেনে নেয়। বিবাদ বিসম্বাদ করে না।

বৃষ্টির তোড়ে গা ভাসান দিয়ে মন্থর গতিতে সে এগিয়ে চললো। এমনি মসৃন আর মন্থর তার গতি যেন তার চেতনার ফাঁকে ফাঁকে ঘুম জড়িয়ে আছে।

একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালো গৌরী। বারান্দার নিচেটা অন্ধকার। অন্ধকারের আড়াল পেয়ে গৌরী যেন স্বস্তি

অনুভব করলো। সামনে রাস্তার ওপারে পোখরাজ বাঈজীর বাড়ি। নিচে দোকান ঘর। বাড়ির সদরটা একটা সরু গলির ভিতরে। ওই সেই গলি।

ওই বাড়ি। উপরের ঘরে আলো জ্বলছে। কাচের সার্শির গায়ে বাহারী রঙিন পর্দা।

না। ভুল হয়নি।

বাড়িটার পানে একদৃষ্টে চেয়ে সে অন্ধকারের আবছায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

গাড়ি বারান্দার নিচে একটা ফার্ণিচারের দোকান। দোকানের দরজাটা আধ-ভেজানো। দোকানের ভিতর মানুষের গলার স্বর শোনা গেল। কারা কথা বলছে। যারা কথা বলছে তারা দরজার আড়ালে ঘুপসি অন্ধকারে বসে আছে। পেছনে অনেকদূরে বোধ হয় টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে।

গৌরীর কানে আসছে তাদের টুকরো টুকরো কথাগুলো। হঠাৎ একজনের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হলো। সে চমকে উঠে দরজার কাছে আরেকটু সরে গেল। কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে তার কানে এলো।

একজন বলছে, ও লাল মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছে। ওর আর রক্ষে নেই। গৌরীর তোমার কপাল ভাঙলো কল্যাণ।

কল্যাণ! গৌরীর স্মৃতির বুকে যেন সাপে ছোবল মারলো। দিদির বাড়ীর পাশের সেই কল্যাণ নাকি?

কল্যাণ বললে, তাইতো আমি ভাবছি রে অশোক সংসারে কি খাঁটি জিনিস দুর্লভ হয়ে গেল? সত্যিকার দামি জিনিষ কি পৃথিবী থেকে উবে গেল? গৌরীর মতো মেয়ের প্রেমকে উপেক্ষা করে যে এই নরকে হাবুডুবু খায়, সে কী মানুষ না আর কিছু? এই নর্দমার পাঁক মেখে গায়ে ও দেবীকে স্পর্শ করে কেমন করে? ছি ছি, ওর যে

এমন অধঃপতন ঘটবে অশোক আমি দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। ওকে আমি শ্রদ্ধা করেছি, ওর প্রেমের দুঃসাহসকে মনে মনে প্রশংসা করেছি। ওর প্রেমে গৌরীকে সুখি দেখে আমি যে কতো খুশি হয়েছিলুম তোকে কি বলবো।

—তোর খুশির কথা ভাবতে গেলে কল্যাণ আমার তো মাথা খারাপ হয়ে যায়। পাগলামী ছাড়া তোর এ ভালোবাসার কোন ব্যাখ্যা হয় না। অন্তত আমি তো কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

—পাবি কেমন করে? ভালো তো কারুকে বাসিসনি। আর এ তো আমার প্রেম নয়। এ পূজা। আমি ওকে পূজা করি। আমার চোখে ও দেবী। ও আমার ধ্যানমূর্তি। আমার কল্পলোক। ও মনে মোহ আনে না। ওকে তো আমি কামনা করি না। ওর গায়ে যে দাগ লাগবে। ও পরস্ত্রী।

—দেবী ও তো ভক্তর কাছে অনধিগম্য নয়। কিন্তু তোর দেঁবী যে দুরধিগম্য। দুর্লক্ষ্য দুর্গম।

—আমি দূর থেকেই তো দেখি। ওকে দেখতেই তো এই দূরপথ অতিক্রম করে কলকাতায় ছুটে আসি। কাছে যাবার তো কোন দরকার নেই। আমার তো কোন প্রার্থনা নেই দেবীর কাছে। কোন যাচিঞা নেই।......

গৌরী দুলে উঠেছে। বিস্মৃতির অতল তলে স্মৃতির কাল নাগিনী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কল্যাণ তাকে আজো ভোলেনি। তাকে সে পূজা করে। তাকে সে ধ্যান করে। তাকে দেখবার জন্যে কোন দূরদেশ থেকে ছুটে আসে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙা গলায় কল্যাণ বললে, বিধাতা কি জেগে নেই রে অশোক, নইলে ঐ মেয়ের কপালে এমন দুর্ভোগ ঘটে?

—তোর এই দীর্ঘ সাতবছরের পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস হয়তো—

—চোপ! ও-কথা মুখে আনিসনি অশোক। ওর মঙ্গল চিন্তা ওর কল্যাণ আমার জীবনের অনুধ্যান। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন।...

একখানা ঝকঝকে নতুন মোটর এসে রাস্তার ও-পারে গলির মুখে দাঁড়ালো। গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির ভেতরের আলোগুলো জ্বলে উঠলো। ভিতরের উজ্জ্বল আলোকে গৌরী দেখলে অতুলের বুকের উপর মাথা রেখে মদালসা পোখরাজ বাঈজি অর্ধনিমিলিত নয়নে অতুলের মুখপানে চেয়ে আছে। অতুলের একখানা হাত তার কণ্ঠবেষ্টন করে আছে।

গৌরী তুহাতে একটা পোষ্ট চেপে ধরে নিস্পন্দ হয়ে গেল। তার চিৎকার করে ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছা হলো তার উপস্থিতির স্তব্ধতা। কিন্তু তার কণ্ঠ দিয়ে স্বর নির্গত হলো না। কে যেন তার গলা টিপে ধরলো। তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। তার দম বন্ধ হয়ে এলো। মনে হলো সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাবে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কল্যাণ ও অতুল-পোখরাজের যুগল রূপ দর্শন করলো। তার হৃৎপিণ্ডটা যেন বুক থেকে ছিটকে মাটিতে খসে পড়লো। সে অশোকের গলা জড়িয়ে ধবে অব্যক্ত যাতনায় একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো: গৌরী!

পর্তুগীজ গির্জার ঘড়িতে বাবোটা বাজলো।

তুঃখের রাত্রি দীর্ঘ হলেও প্রভাত হয়।

কল্যাণের ও তুঃস্বপ্ন-মথিত, শোকাবিষ্ট বিনিদ্র রাত্রি প্রভাত হলো।

রাতের অন্ধকার কেটে গেল, কিন্তু তার মনের অন্ধকার তো কাটলো না। এই দীর্ঘ সাতটি বছরের প্রতিটি নির্মল স্বচ্ছ প্রভাতের নতুন আলোয় যার মুখখানি স্মরণ করে তার মনের আকাশ আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে, আজ তাকে মনে করতে ব্যথায় বুক ভেঙ্গে

যায়। দুরন্ত শীতের একটা হিমপ্রবাহের মতো তার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তোলে। তার প্রাণের স্পন্দন থেমে যায়।

গৌরীর জীবনে যে এমনি দুঃখ-অপমানের দুর্যোগ দেখা দেবে এ-যেন তার কাছে একটা অভাবিত বিস্ময়। গৌরীকে একবার ভালো-বেসে যে কেউ ভুলতে পারে এ-যেন তার কাছে একটা অসম্ভব অঘটন। কতো আলো, কতো আলোকিত শুভ্রতা তার দেহের প্রতিটি অবয়বে। কতো নির্মলতা, কতো শুচিতা তার হাসির হিল্লোলে। কতো বাণী, কতো কবিতা তার কালো চোখের ঈক্ষন-ঈঙ্গিতে। কতো জড়িমা তার দীর্ঘ নয়নপল্লবে।

গৌরী কোনদিন তার নিভৃত স্নেহচ্ছায়ায় এসে দাঁড়ায়নি। তার প্রতি চিরদিন সে উদাসীন, নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত। বরং কিছুটা নিষ্ঠুর। কল্যাণই কতো ঝাঁকে, কতোদিন তাকে গোপনে দেখেছে। দেখবার জন্য আকুল হয়ে তার পথের ধারে অপেক্ষা করেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেখা হলেই চোখোচাখি হলেই সে অবিচল স্পর্ধিত দৃষ্টিতে তার পানে তাকাতো। উদ্ধত নির্মমতার ভঙ্গিতেও কল্যাণ দেখতে পেতো এক অলৌকিক আবির্ভাব। অনুভব করতো এক পরমাশ্চর্য আনন্দ চেতনা।

মনে আছে বই কি গৌরীর প্রত্যাখ্যান। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ক্ষ্যাপার মতো যতই হাত বাড়াও না, নাগাল পাবে না।

হেসেছিল কল্যাণ মনে মনে। সেই রূঢ় প্রত্যাখ্যানের মাঝেও সে একটা মধুর আস্বাদ পেয়েছিল। তার কণ্ঠের ঝঙ্কারে একটা গান শুনেছিল। ঐশ্বর্য ছিল বই কি, জ্যোতির্ময়তা ছিল বই কি তার বিক্ষুব্ধ তেজস্বিতায়।

সেই তো তার আসল রূপ। সেই তো তার জীবনের ছন্দ।

সেই ছন্দোময়, দৃষ্টি-সুন্দর জীবনে এ বিপর্যয় ঘটলো কেমন করে? এ যেন প্রকৃতির বিপর্যয়ের মতো। অন্ধকারের নিঃশব্দতায় আকস্মিক

ঘাতাবর্তের মতো। ওলোট-পালোট করে দিল একটি ছন্দোময় সুখের সংসারকে।

গৌরীর কি ঘুম ভেঙ্গেছে ? সঙ্কেত পেয়েছে কি সে এই সর্বনাশের ? কে জানে ?

অতুল একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন পশু। একটা সুন্দর শয়তান। বাইরেটা যার অতো সুন্দর ভিতরটা তার এতো কুৎসিত।

এতোদিন পরে আজ প্রথম তার মনে হলো গৌরী নির্বাচনে ভুল করেছিল। তার রূপ ওকে মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। আঁধি ঝড়ের মতো ওকে অন্ধ করে দিয়েছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্দাম যৌবনের পটভূমিতে সদ্যোজাত প্রেমের পক্ষে হয়তো তাই সহজাত। সে নীতিধর্ম মানে না, সংস্কার মানে না, সহজ সাধারণ বোধবুদ্ধিকে উপেক্ষা করে। নিজের নির্বাচনকেই সে স্বাগত জানায়। চোখের ভালো লাগাকেই সব চেয়ে উঁচুতে স্থান দেয়। সেও হয়তো বা স্বাভাবিক। কিন্তু সময়কে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া এ-সব ক্ষেত্রে মোটেই সমীচীন ও শুভ নয়।

নির্বাচনে দ্রুততা সব চেয়ে মারাত্মক।

কল্যাণের মনে হয় গৌরী সেইখানেই ভুল করেছিল। গৌরী অসম্ভব দ্রুতগতিতে, ঝড়ো হাওয়ার মতো এগিয়ে গিয়েছিল, বোধ হয় পথের বাধা বিঘ্নকে অবহেলায় অতিক্রম করবার জন্যই সে অযথা গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ভুল সেইখানেই করেছিল গৌরী। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটবার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। তাড়াতাড়ি ফোটাবার জন্য কোন কৌশল করতে গেলে কোরকের অপমৃত্যু ঘটে। ফুল হয় না।

অতুলের অপরিসীম সৌন্দর্যের আলো তার মনকে চমকে দিয়েছিল, চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, তার যৌবন-বিস্ফারিত দেহের কামনা দাউ দাউ করে শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠেছিল। নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার জন্য সে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। তার হিতাহিত চিন্তা করবার সময়

কোথা ? সময় কোথা তার অতুলকে ভালো করে চেনবার, জানবার ? তা ছাড়া সময় দিতে গেলে চারিদিক থেকে প্রতিবাদের তুমুল ঝড় উঠবে। নিরুপায় হয়েই বেচারীকে দ্রুতগতিতে মনস্থির করতে হয়েছিল এবং অতুলকে স্বামীত্বে বরণ করতে হয়েছিল।

না না। গৌরীকে সে বিচার করবে না। হয়তো সে নির্ভুল। আর ভুলই যদি সে করে থাকে, ভুল করেছে তার উদ্দাম যৌবন। ভুল করবার তার স্বাধীনতা আছে। অধিকার আছে। সে ভুলের ক্ষমা আছে। কিন্তু অতুলের কোন অধিকার নেই নিজের স্ত্রীকে, তার সন্তানের জননীকে এমন ভাবে অবহেলা ও অপমান করবার! তার জীবনকে এমন ভাবে ব্যর্থ করবার।

কিন্তু কল্যাণ এখন করবে কী ?

তার কর্তব্য কী ?

অতুলের সঙ্গে দেখা করবে ? তাই বা করবে কেমন করে ? কী বলবে সে তাকে ? স্বামী-স্ত্রীর গার্হস্থ্য জীবনে সে মাথা গলাতে যাবে কেমন করে ?

তা ছাড়া গৌরী ব্যাপারটা জানে কিনা কে জানে ? জেনেও যদি শান্তির সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করতে না চায় ?

সংসারে দুর্দান্ত, দুরন্ত ও কপট স্বামীর স্ত্রীরাই চিরদিন নিষ্ঠ পতিব্রতা।

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। দরজাটা খুলে গেল।

কল্যাণ চমকে সোজা উঠে দাঁড়ালো। যেন অন্ধকারে ভূত দেখেছে। তার দম বন্ধ হয়ে এলো। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী।

—ভেতরে আসবো ?

অনেক দূর থেকে ক্ষীণ অশরীরী কণ্ঠে কে যেন অনুমতি প্রার্থনা করলো। যেন গৌরীর কণ্ঠ নয়।

বিশ্বাস করতে পারে না কল্যাণ নিজের চোখকে। নিজের কানকে। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।

—কী কথা বলছো না যে? আমি গৌরী। আমাকে চিনতে পারচো না?

স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মতো বিহ্বল নয়নে তার পানে চেয়ে দ্বিধা জড়িত অস্ফুট কণ্ঠে কল্যাণ বললে, তুমি গৌরী? তুমি ঘরে আসবে?

—হাঁ। একলা আছো তো? তোমার সঙ্গে আমার জরুরী গোপন কথা আছে।

কল্যাণ তার মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। চোখ দুটো যেন তার মুখের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমন্তের মতোই টেনে টেনে বললে, আমার সঙ্গে জরুরী গোপন কথা আছে? আমার সঙ্গে?

—হাঁ তোমার সঙ্গে। বিশেষ জরুরী কথা। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

ঘরের ভিতর তার সামনে এসে গলায় জোর দিয়ে বললে।

নির্ভুল গৌরীর কণ্ঠ! স্বপ্ন নয়। ছায়া নয়। রক্তমাংসের গৌরী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্নের গৌরী বাস্তবের সীমানায় ফিরে এসেছে। কল্যাণের ঘোর কেটে গেল। সে মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো: বাড়ীতে কেউ নেই। ওপরে চলো গৌরী। আমি সদরটা বন্ধ করে আসছি।

উপরের ঘরে কল্যাণ একখানা চেয়ার টেনে দিয়ে গৌরীকে বসতে বললে।

গৌরী বসলো না। স্তব্ধ হয়ে তার মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার মর্মমূল থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তার চোখ দুটো কল্যাণের মুখের উপর মুহূর্ত জ্বলে উঠে বুঁজে গেল।

কল্যাণের বুকের রক্ত দুলে উঠলো। গৌরীর মরণপাংশু বিবর্ণ মুখ

তাকে আতঙ্কিত করে তুললো। তার নিরাভরণ দেহ, তার এলোমেলো বেশবাস, তার ভগ্নভঙ্গি কল্যাণের বুকে ধারালো ফলার মতো বিঁধলো।

এ যেন গৌরীর ধ্বংসাবশেষ! তীব্র শীতের একটা পাতা ঝরা গাছ। একটা মরা মজা নদি!

অস্থির উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে কল্যাণ বললে, তুমি বিছানায় উঠে বসো গৌরী। তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। তোমার শরীর ভালো নেই। তুমি বিশ্রাম করো। আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

—না। না। কিছু করতে হবে না। আমি বেশ ভালোই আছি।

গৌরী বিছানায় উঠে নির্জীবের মতো খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসলো। মনে হলো যেন এখুনি সে ঘুমিয়ে পড়বে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কল্যাণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালা হাতে কল্যাণ যখন ঘরে ঢুকলো তখনো গৌরী ঠিক তেমনি ভাবে নিস্পন্দের মতো বসে আছে। চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে গৌরী চোখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাইলো। তার শুষ্ক ঠোঁটে পিছলে এলো ক্ষীণ হাসি। সে নিষ্প্রাণ স্খলিত স্বরে বললে, আমাকে এমনি বন্দী করে রেখে দিতে পারোনা কল্যাণ?

কল্যাণের গা শিরশির করে ওঠে গৌরীর কণ্ঠের অন্তরঙ্গতায়। 'আপনি' নয়, 'কল্যাণবাবু' নয়।

কল্যাণ মনে মনে বললো: তোমাকে আর নতুন করে বন্দী করবো কি, তুমি তো চিরবন্দী আমার স্বপ্ন কারাগারে। মুখে বললে, তোমার কি হয়েছে তাই বলো গৌরী, তোমার এমন দশা কেন?

গৌরীর চোখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠলো, ঠোঁটে জ্বলে উঠলো মর্মান্তিক বিদ্রূপের হাসি। একটা অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে সে বললে, তুমিও ছলনা করছো আমার সঙ্গে? ছলনা আর কপটতাই কি পুরুষের অস্থিমজ্জা? পুরুষ জীবনের একমাত্র আখ্যা?

—আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করবো গৌরী ?

অস্ফুট উচ্চারিত হলো কল্যাণের গলা থেকে।

গৌরী ঝলসে উঠলো ঃ তবে কি আমার দুর্দশার বিশদ বিবরণটা নতুন করে আমারই মুখ থেকে শুনতে চাও ? কাল রাত্রে অঝোর বিষ্টিতে ভিজে নিজের চোখে দেখে আসোনি গৌরীর দাম্পত্যের চিতারচনা ? মুঠো ভরতি করে তুলে আনোনি তার চিতাভস্ম, তার অস্থিচূর্ণ ? বিষ্টির জলের সঙ্গে মিশিয়ে যায়নি চোখের দুফোঁটা অশ্রুজল ?

একটা অতিকায় বিস্ময়ের মতো গৌরীর কথাগুলো কল্যাণকে প্রচণ্ড আঘাত করলো। আঘাতের তীব্র বেদনায় কল্যাণ অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু তুমি জানলে কেমন করে গৌরী ?

—আমি জানলুম কেমন করে ?

গৌরীর কণ্ঠ থেকে নির্গত হলো একটা অস্ফুট হাসির শব্দ। শোনালো যেন বুক ফাটা কান্নার মতো।

—আমিও যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, আমারই চিতার ওপর কেমন করে তারা রঙমহল গড়ছিল। নতুন ঝকঝকে গ্যারেজের নম্বর দেওয়া গাড়ি। চকোলেট রঙ।

গৌরী হঠাৎ থেমে গেল। তার গলাব স্বর বুঝি বুজে এলো। সে দুহাতে মুখ ঢেকে যেন এই পরাজয়ের দুঃসহ লজ্জাকে গোপন করতে চাইলো। সে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

কল্যাণ তার পানে চেয়ে পাথর হয়ে গেল। তার সংশয় নিরসন হয়েছে। সে দেখেছিল বই কি ওয়াটার প্রুফের মোড়ক করা গৌরীকে। গৌরীকে চিনতে না পারলেও গৌরীকে সে মনে করিয়ে দিয়েছিল। গৌরী তাহলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এসেছে তাদের নৈশলীলা।

গৌরী কাঁদছে। অপমানের নিদারুণ লজ্জায়। কল্যাণ জড়ের মতো স্তুপীভূত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। তাকে সান্ত্বনা দেবার,

সহানুভূতি জানাবার ভাষা পেল না কণ্ঠে। কী বলবে সে তাকে—যার নারীত্ব, স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্ব লাঞ্ছনার ধূলায় ধূসর। যার যৌবন কোরক উন্মীলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে ঝরে পড়লো অপমানের রুদ্রদাহে।

কী বলে বোঝাবে সে তাকে ?

ভালোবাসা দিয়ে যে ভালোবাসা পেলে না, পেলো শুধু বঞ্চনা, তার সান্ত্বনা কোথায় ? শান্তি কোথায় ?

নিশ্বাসহীন নিস্তব্ধতায় ঘরখানা ভারি হয়ে উঠেছে। ঘরের হাওয়া যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। এমনি শোকাকুল স্তব্ধতা। সামনে তার বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো মুখ ঢেকে কাঁদছে গৌরী। তার সমস্ত শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। রুক্ষ, শিথিল খোঁপাটা তার কাঁধের উপর ভেঙ্গে পড়ে লুটোচ্ছে। কাদামাখা আধ-ময়লা শাড়িখানা এলোমেলো। পূজোর বিসর্জন দেওয়া প্রতিমাকে যেন জল থেকে তুলে এনেছে।

কল্যাণ স্থির থাকতে পারলো না। সে ধীর পায়ে আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

সেই ক্ষীণতম মুহূর্তটির অপার স্তব্ধতা, গৌরীর সুনিবিড় সান্নিধ্যের সৌরভ তার শরীরে জাগালো একটা মৃদু চঞ্চলতা। একটি ভীরু অভিলাষ, তাকে সস্নেহ একটি স্পর্শ দিয়ে তার ব্যথা মুছিয়ে দেবার জন্য তার দেহের অনু-পরমানু পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু তার সাহস হলো না। সঙ্কোচের শেষ রইলো না। হাত বাড়িয়ে সসঙ্কোচে হাত গুটিয়ে নিল।

সে পরস্ত্রী। তার অনধিগম্য।

গৌরী বোধ হয় তার সান্নিধ্যের উত্তাপে মুখ তুলে তার পানে তাকালো। অশ্রু-আকুল অগাধ অসহায় চোখে। হঠাৎ সে দুহাতে কল্যাণের হাত দুখানি চেপে ধরে বলে উঠলো, তুমি বলে দাও, আমি

এখন কী করবো ? এতোদিন চিনতে না পারলেও আমার বন্ধু বলতে, আপন জন বলতে আর ত্রিসংসারে কেউ নেই।

কল্যাণ কেঁপে উঠলো। তার স্পর্শের কুহকে তার শরীরের রক্ত গলে মুখ ছাপিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় গোড়ায় ধাক্কা দিল। সে আচ্ছন্নের মতো কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বললে, তা আমি জানি। তোমার নিকটতম আত্মীয়দের কাছে তোমার নাম উচ্চারণ করাও মারাত্মক অপরাধ। তুমি তাদের কাছে অস্পৃশ্য। দুঃশীল।

—আমি জানি। কারুর কাছে আমার আর কোন মূল্য নেই। আমি এখন পথের আবর্জনা। বিষিত কণ্টক। আমার জীবন একটা কলঙ্কিত ইতিহাস। তাই তো তোমার কাছে এলুম। জানি না আমি নিজে এলুম না আমার বিরূপ বিধাতা আমায় নির্ভুল পথের সঙ্কেত দিল। আমার চোখে আঙুল দিয়ে আমায় পথের নির্দেশ দিল।

কল্যাণ আর্দ্র তরল কণ্ঠে বললে, তুমি বলো, আমি কি করবো। তুমি আদেশ করো আমি সানন্দে পালন করবো !

গৌরীর চোখদুটি শিখায় জ্বলে উঠলো। সে স্থির অবিচলিত দৃষ্টি দিয়ে কল্যাণের পানে চেয়ে রইলো। পরক্ষণেই তার চোখ বেয়ে পাণ্ডুর গালের উপর দুটি অশ্রুর শীর্ণধারা নামলো।

ব্যথিত কল্যাণ ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, কুণ্ঠা করো না। দ্বিধা করো না। আমাকে বলো কি করলে তোমার শুভ হবে, আমি নির্বিচারে তাই করবো। তুমি আদেশ করলে আমি অতুলের কাছে যেতে পারি —আমি—

গৌরী একটা অদ্ভুত হাসির শব্দ করে তাকে থামিয়ে দিল। তার মেরুদণ্ড উদ্ধত হয়ে উঠলো। সে সোজা হয়ে বসে স্পষ্ট, নিষ্কম্প গলায় বললে, ও-নাম আর আমার কাছে উচ্চারণ করো না। বললুম না ও পরিচয়কে চিরদিনের জন্য চিতায় তুলে দিয়ে এসেছি। বিস্মৃত অতীতের ভস্মস্তুপে চাপা দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। অবাক হয়ে

যাচ্ছ কেন? এ সত্যি। বিশ্বাস করো। কাল রাত্রে বিষ্টির তোড়ে ও কলঙ্কিত পরিচয়কে ভাসিয়ে দিয়ে গা-হাত ধুয়ে ভোরের অন্ধকারে মেয়েকে কোলে নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশের অবারিত শূন্যতায়। দেখছো না? গা থেকে খুলে রেখে এসেছি সব গয়না। হাতে এ তোমার দেওয়া কঙ্কণ, আর কানে এ নিজের কেনা দুল। তার দেওয়া সব কিছু ফেলে দিয়ে এসেছি।

—তার সঙ্গে দেখা হয়নি?

কল্যাণ প্রশ্ন করলো।

—না। সে তো তখন বাঈজীর রঙমহলে। বাঈজীর বাহুবন্ধনে হয়তো ঘুমে অচেতন। রাত্রে স্বচক্ষে যা দেখে এসেছি, তারপর তার সঙ্গে আবার দেখা করার কোন অর্থ হয় নাকি?—না রুচি হয়?

—তোমার মেয়ে?

—তাকে এক বন্ধুর কাছে রেখে তোমার এখানে এসেছি।

কল্যাণ এক ভাবনার অকুল সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে যেন আত্মবিস্মৃতের মতো বিহ্বল গলায় বললে, কিন্তু—

গৌরী যেন আচম্বিতে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলে। সে অধৈর্যের মতো বলে উঠলো, সব 'কিন্তু' শেষ করে এসেছি। তোমার কাছে আমি উপদেশ নিতে আসিনি। কেন এসেছি তাই বলি শোন।

পাশের বাড়ির ছাদ টপকে, পূবদিকের জানলা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে গৌরীর গায়ে লুটিয়ে পড়েছে। সোনার গুঁড়োর মতো কচি রোদ! ফুলের দণ্ডের মতো গৌরীর শুভ্র নিটোল একখানি হাতকে যেন জড়িয়ে ধরেছে। গৌরীর ঘুম জড়ানো ক্লান্ত চোখ দুটিতে স্বপ্নের ঘোর। আগেকার দিনের মতো এখনো ছেলেমানুষী ভাবটুকু আছে। কল্যাণ বাণীহীন স্তব্ধ বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে রইলো। কী বলে তাই শোনবার প্রতীক্ষায় তার হৃদয় স্পন্দিত হতে লাগল।

গৌরী বললে, চোরাবালিতে ডুবতে ডুবতে হঠাৎ পায়ে পাথর

ঠেকলো। তোমার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। সত্যিই মনের কোন কোনে তোমার ছায়ামাত্র ছিল না। কাল, বহুদিন পরে আমার সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে দৈবাৎ কানে এসে পৌঁছলো তোমার কণ্ঠস্বর : তোমার প্রচ্ছন্ন অন্তরের বাণী—ঈশ্বরের আশীর্বাণীর মতো। শুনলুম তুমি আমায় পূজো করো। এই দীর্ঘ সাত বছর ধরে আমার অগোচরে আমায় ভালোবাসা দিয়ে পূজো করে আসছো। আজো তুমি আমায় ভোলোনি। এখনো তুমি আমায় গোপনে দেখবার জন্যে এবং আমার ভালোমন্দর খবর নেবার জন্যে দূর কর্মস্থান থেকে ছুটে ছুটে কলকাতায় আসো!

একটু থেমে গৌরী গাঢ় কম্পিত কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলো, এ-সব সত্যি না মুখের কথা?

—অন্তরের সত্যি গৌরী! ঈশ্বরের নামের মতো সত্যি আর পবিত্র।

গৌরীর মর্মমূল কেঁপে উঠলো। একটা লম্বা নিশ্বাস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো। তার চোখ দুটি অশ্রুতে আকুল হয়ে উঠলো। সে আনত ভঙ্গিতে গদগদ স্বরে বললে, হয়তো সত্যি। সত্যি ভেবেই তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, তবু আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাবার, আমার ব্যথায় ব্যথিত হবার পৃথিবীতে অন্তত একজনও আছে।

কল্যাণ নিঃশব্দে মাথা নিচু করলো। তার বুকের তলায় বাষ্পের জোয়ার উঠলো। কথা বলতে পারলে না।

গৌরী বললে, সেই দুর্যোগময়ী রাত্রির আশাহীন অন্ধকারে আমার মনে হলো, পথ আমার ফুরিয়ে যায়নি, মুছে যায়নি। পথ আমায় আবার ডাক দিল। পথের দিশা পেলুম। চোরাবালিতে ডুবতে ডুবতে পায়ে পাথর ঠেকলো!

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে কল্যাণের হাত ধরে সে বললে, আমি বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচতে হবে। নিজের জন্যে না হলেও আমার সন্তানের জন্যে। আমার সন্তানকে বুকে করে আমি পথে নেমে এসেছি। মাথার ওপর আমার আবরণ নেই। পায়ের নিচে নেই মাটি। তাই তোমার কাছে আমি আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি। একটু স্নেহের আশ্রয়। করুণার আশ্রয়। আমার ভাগ্য আমায় ঠেলে দিল তোমার কাছে। নিরুপায়তার লজ্জা নেই। সঙ্কটের সঙ্কোচ নেই। এ একটা প্রকৃতিক দুর্ঘটনার মতো আমাকে গৃহহীন আশ্রয়হীন করেছে।

কল্যাণের বুকে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। এতোটা সে আশা করেনি। গৌরী আসবে তার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে! এ যেন তার ধ্যান ধারণার অতীত। গৌরীর এই অভাবিত আবির্ভাব তার কাছে একটা পরমাশ্চর্য ঘটনা। দৈবের দুর্ঘটনার মতো। তার উপস্থিতির উত্তাল তরঙ্গ, তার মিনতি-সজল কাতর প্রার্থনা তার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে মুহুর্মুহু আঘাত করছে। এই দীর্ঘ সাতটি বছরের দিনে দিনে গড়া তার প্রেমের মন্দির যার জন্যে সাজিয়ে অবারিত করে রেখেছে, সেই দেবী আজ কিনা ভিখারীর মতো মন্দিরে প্রবেশাধিকার চাইছে। তার চির-প্রার্থিত এসেছে প্রার্থীর বেশে। এ দৈবের লীলা বই কি! এ তার প্রেমের পুরস্কার। তার তপস্যার সিদ্ধি। দেবী এসেছে তার পূজা নিতে। সে স্বপ্নাকুল চোখে গৌরীর পানে তাকালো।

একটা বিশাল সূর্যমুখী ফুল যেন সূর্যের পানে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থর-থর করে কাঁপছে, বিকশিত হবার ঔৎসুক্যে। এমন একান্তে, এমন নিবিড় নিভৃতিতে আর কখনো তো সে গৌরীকে দেখে নি। গৌরী তার জীবন আকাশে মুক্তির নীলিমা। এ তার নিজের রচনা। দীর্ঘ সাত বছর ধরে কবির স্বপ্ন দিয়ে, কল্পনার তিল তিল সুষমা দিয়ে, প্রেমের অলৌকিক মাধুর্য দিয়ে গড়েছে তাকে।...

সে তো তার অভ্যর্থনার দুয়ার খুলে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্য আসন তো পাতাই আছে। তাকে সে নতুন করে আহ্বান করবে কি বলে? তার কথা বলার শক্তি যে হারিয়ে গেল তার শরীরের স্তব্ধতায়। সে সমস্ত চেতনা দিয়ে শুধু অনুভব করছে তার স্পর্শের শীতলতা। আত্মার নিভৃতে বাজছে একটা গভীর আত্মীয়তার আশ্চর্য সুর।

সে তো নতুন করে আসেনি। চিরদিনই ছিল তার কাছে। ছিল তার আত্মার শুভ্রতায়। ছিল তার ধ্যানের স্তব্ধতায়। ছিল তার প্রেমের মৌনতায়। আজ সে স্পর্শময়ী। শব্দময়ী। উত্তাল তরঙ্গময়ী। উপস্থিতিব তরঙ্গ তুলে তার মনে এক অভিনব বিপ্লব বাধিয়ে দিয়েছে। তার সংযমী মনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সে ভাবনার তরঙ্গে দুলতে দুলতে ভেসে চলেছিল, হঠাৎ গৌরী তরঙ্গ ভঙ্গের মতো মুখর হয়ে উঠলো: তোমার মনের কথা আমি জানি, কল্যাণ। আমিই তোমাব কাছে ঝাপসা আর ঘোলাটে। কিন্তু আজ আর আমার মাঝে নেই এতোটুকু কুয়াশা। লজ্জাব বাষ্প নেই। জীবন মরনের কিনারে দাঁড়িয়ে লজ্জা করলে, মান-সম্ভ্রমের কথা ভাবলে চলবে কেন? আমাকে তুমি ভুল বুঝোনো। আমি তোমার নায়িকা হতে চাই না, আমি নিরাপদ আশ্রয় চাই, তোমার বন্ধুতার সহায় চাই। সাহচর্য চাই। আমি তোমার পবিচয়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নিজেকে লুকোতে চাই না। পারি তো নিজের পবিচয়ে বাঁচবো। তোমার সহায় না পেলে আমার মেয়েকে আমি বাঁচাতে পারবো না। নিজের আত্মসম্মান অক্ষুন্ন বাখা দায় হবে। পুরুষের সবল সহায় আর স্নেহের আওতা না পেলে নারী বাঁচে না।

কল্যাণ মাথা তুলে বললে, পুরুষের সবল সহায় নারীর অস্তিত্ব বাঁচাতে পারে গৌরী, পারে না বিবাহিতা নারীর সুনাম ও সম্ভ্রম বাঁচাতে।

—ভুলের খেসারৎ দিতে হবে বই কি! তার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছি। দুর্নাম, কলঙ্ক ও-সব ভাবের একটা বিদ্যুৎ ছটা ভিন্ন কিছু নয়। ও-সব আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওতে আমার আর পা টলবে না। মন দুলবে না। তুমি নিজের কথা ভেবে বলো। আমার জন্যে পারবে না এই কলঙ্কের বোঝা বইতে? পারবে না দুটি প্রাণীকে বাঁচাবার জন্যে দুর্ণাম কিনতে? পারবে না তোমার নির্মল নিষ্কাম ভালোবাসা অপযশের আঘাত সহ্য করতে? স্থূল কামনার পৃথিবীতে প্রেম তো নয় একটা ভাবময় স্বপ্ন। দেহের সন্তানের মতোই কলঙ্ক যে প্রেমের একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমি তো জানি প্রেম চিরদিন দুঃসাহসী। দুর্বার।

কল্যাণের ঠোঁটের উপর একটুকরো হাসি ভেসে উঠেই ডুবে গেল। সে ঋজু হয়ে মাথা তুলে তাকালো গৌরীর চোখে চোখ রেখে। তার দৃষ্টিতে প্রচণ্ড প্রেমের আকুতির সঙ্গে একটা কঠিন অনমনীয়তা। তার শান্ত নিরীহ চেহারাটা যেন হঠাৎ ধনুকের মতো আঁট হয়ে উঠেছে। তার মুখের প্রতিটি রেখায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে দুর্বার শক্তি ও উদ্ধত পৌরুষ। পুরুষের ঐ রূপ নারী মনে কাঁপন ধরায়। গৌরী তার চোখের সে জ্বলজ্যোতি সহ্য করতে পারলো না। মাথা হেঁট করলো।

কল্যাণ অবিচলিত, অকম্পিত স্বরে বললে, আমার প্রেম নির্বাক ও নিঃসঙ্গ হলেও প্রাণহীন নয়। নিরর্থক নয়। তোমার জন্যে সে কি পারে না পারে তার কোন নিরীখ নেই। পরিমাপ নেই। তাকে যাচাই করতে চেয়ো না। তাকে বিশ্বাস করো। তার উপর নির্ভর করো। তোমার সুখের জন্যে সে দুঃসাধ্য সাধন করবে।

—তবে?

বাষ্পাকুল নয়নে গৌরী প্রশ্ন করলে।

কল্যাণ বললে, আমাদের মনে যা-ই থাক তোমাকে স্বামীর আশ্রয়চ্যুত করে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ হলো পরস্ত্রীকে অপহরণ করা।

সমাজের চোখে, আইনের চোখে একটা জঘন্য অপরাধ। তোমার জন্যে সে দায়িত্বের গুরুভার ও বহন করবার মতো সাহস ও শক্তি আমার আছে। কিন্তু তোমার গায়ে আমি ধূলোকাদা মাখাবো কেমন করে?

গৌরীর মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠলো, অস্তিমের আভার মতো। বললে, তোমার ছায়ায় আশ্রয় নিলে আমায় কুলটা বলবে? তোমার উপস্ত্রী বলবে? বলুক না। আমি গ্রাহ্য করি না। মিথ্যের স্ত্রী হওয়ার চেয়ে সত্যের প্রেয়সী হওয়ার গৌরব ঢের বেশী। জীবনের মন্ত্র আছে। প্রাণের খাদ্য আছে তার মাঝে। আমি বাঁচতে চাই কল্যাণ। ধূলোকাদা মেখেই বাঁচতে চাই। সত্যের অন্বেষণ করতে গেলে গায়ে ধূলো লাগবে বই কি।

কল্যাণ পাথরের মূর্তির মতো মাথা নিচু করে বসে আছে। কী যেন ভাবছে। শুধু ভাবছে না, নিদারুণ কিছু করবার একটা প্রস্তুতির ছক আঁকছে মনে মনে। নির্দিষ্ট ভবিষ্যতকে মোড় ঘুরিয়ে নতুন অজানা পথের সঙ্কেত দিচ্ছে। এই একান্ত অসহায় সুন্দরী মেয়েটি তাকে একটা সঙিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছে। সে পরীক্ষায় তাকে জয়ী হতে হবে। মেয়েটির করুণ আহ্বানে তাকে সাড়া দিতে হবে।

গৌরী তার আনত ভঙ্গির পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার রক্তিম ঠোঁট-দুটি ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। তার ভাবলেশহীন মুখে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। কল্যাণের মুখের শেষ কথাটি শোনবার স্তব্ধতা তাকে অনুপরমাণুতে গ্রাস করেছে।

ঘরের মাঝে দুর্ভেদ্য নীরবতা। সেই নিঃশব্দতার নির্জীব অন্ধকারে দুজনে নিরবয়ব ছায়ার মতো নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। তারা নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করছে। নতুন জীবনের সূচনা আঁকছে। পুরোনো পৃথিবী আর চলছে না। সময়ের গতি গেছে তাদের সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে।

গৌরী হঠাৎ চমকে উঠলো কল্যাণের নিঃশব্দ স্পর্শের ডাকে। তার কাঁধে হাত দিয়ে কল্যাণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। আঙুলের ধাক্কা

দিয়ে চুলগুলোকে পেছন পানে ঠেলে দিতে দিতে প্রশ্ন করলো, কখন তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে ?

আচ্ছন্নের মতো গৌরীও উঠে দাঁড়িয়ে বিবশ গলায় উত্তর দিল, কোথায় ?

—আমাদের নতুন পৃথিবীতে। নতুন আকাশের তলায়।

—যখন তুমি বলবে। আজই। এখুনি।

গৌরী উচ্ছ্বসিত অন্ধ আবেগে তার হাত দুটি শক্ত করে চেপে ধরে বললে, হ্যাঁ। তাই নিয়ে চলো আমায় অজানা, অপরিচিত নতুন কোন পৃথিবীতে। মরণ থেকে নতুন কোন জীবনে। হিমশীতল অন্ধকার কবর থেকে অবারিত উন্মুক্ত আকাশের নতুন রৌদ্রে। যেখানে আমাদের পুরোনো পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আমরা নতুন করে জন্ম নেবো।

গৌরীর কম্পিত করতলে কর রেখে কল্যাণ তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়ালো। অটল অনমনীয় দৃঢ়তায়। একটা বিরাট বনস্পতি যেন আশ্রয় লতিকাকে নিজের বিস্তারের মধ্যে টেনে নিয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচিয়ে আকাশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করছে।

গৌরীর বুক কেঁপে উঠলো। তার মনে হলো, দারুময় জগন্নাথ সজীব হয়ে চোখ মেলে চেয়েছে। তার কাতর ক্রন্দন তাকে বিচলিত করে তুলেছে। অস্থির করে তুলেছে।

কল্যাণ স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললে, এখান থেকে আমাদের যেতেই হবে। যেতে হবে চিরদিনের মতো। চেনার মাঝে অচেনা হয়ে থাকার চেয়ে বনবাস ঢের ভালো। তোমার বিরহে বনবিভাগে চাকরী নিয়েছিলুম, নির্জনে তোমাকে ধ্যান করবো বলে। এখন সেইখানে সেই নির্জন বনভূমিতে দুজনে মিলে তপোবন রচনা করবো। প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে নতুন জীবনের গান গাইবো। আমাদের জীবনের কলঙ্ক দিয়ে অমরার কাব্যসৃষ্টি করবো। আজই রাত্রে আমরা যাত্রা করবো, সেই দুর্গম তীর্থপথে।

গৌরীর অশ্রু প্লাবিত মুখে বিশীর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

সেই রাত্রে তারা পায়ের পুরোনো শৃঙ্খল ভেঙ্গে অতীতকে অতিক্রম করে যাত্রা করলো দূর নিরুদ্দেশের পথে। উদার উন্মুক্ত নতুন জীবনের নতুনতরো মুক্তিতে।

সেটা ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই।

ইতিহাসের একটি চিহ্নিত দিন। সেই দিন চীন জাপানের সংগ্রাম সুরু হয়েছিল।

তারপর আর তারা বাঙলার মাটিতে পা দেয়নি। পরিচিত বন্ধনীর মাঝে আর ফিরে আসেনি।

মাথার উপর দিয়ে কতো ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের চাকরী। বনে জঙ্গলে শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের অপার নির্জনতায় বছরের পর বছব কাটিয়ে শেষে গরম পানিতে ফরেস্ট রেঞ্জারের চাকরী পেল কল্যাণ দেশ স্বাধীন হলে।

তাদের প্রথম জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো দ্বিতীয় বছরেই তারা তুজনে এক সঙ্গে বেনারস য়ুনিভার্সিটি থেকে বি-এ পাশ করলো।

এই তু-টি বছর তারা নিজেদের মাঝে একটা বন্ধুতার দেয়াল তুলে দিয়ে পাশাপাশি বাস করছিল। এতো কাছে থেকেও তাদের নিবিড় নৈকট্যের মাঝে ছিল একটি কাচের দেয়াল।

দিনের কথা আলাদা। নিষুপ্ত রাত্রির স্তব্ধ প্রহরে তুজনে পাশাপাশি বসে পরীক্ষার পড়াশুনো করেছে তবু কেউ সে কাচের গায়ে আঙুলের টোকা দিয়ে নিষ্কামতার স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিতে চায় নি। তারা জানতো একদিন ভেঙ্গে পড়তেই হবে। ঘটবেই তাদের চরম বিলুপ্তি। অনর্থক তাড়াতাড়ি করে লাভ কি?

যে-দিন তাদের বি-এ পরীক্ষার ফল বেরুলো সে-দিন গৌরী নিজের হাতে সেই দেয়ালটা ভেঙ্গে দিল। সেই দিনটিকে সে যেন আগে

থেকেই চিহ্নিত করে রেখেছিল। তার মনে পড়তো একদিন কৌতুক করে কল্যাণ বলেছিল, দুজনে একসঙ্গে বি-এ পরীক্ষা দোব। গৌরী ক্ষেপে উঠেছিল, নিষ্ঠুর হয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ক্ষ্যাপার সঙ্গে তার তুলনা করেছিল। কল্যাণের সেই কৌতুক সত্য হয়ে দেখা দিল তার জীবনে। তাই সে সেই দিনটিকে সার্থকতায় ভরিয়ে তুলতে চাইলো। কল্যাণকে কিছু দেবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সে তার অতীতকে মুছে ফেলে, সব সন্ধান, সব জিজ্ঞাসার শেষ করে নিজের হাতে রচনা করলো, আরাম-রমনীয় কোমল সুখশয্যা। শরীরময় ফুটিয়ে তুললো গাঢ়শ্যাম বনচ্ছায়া, যৌবনের যতো আলো, যতো পিপাসা। কামনায় রাঙা হয়ে নববধূর সঙ্কোচ সৌরভ নিয়ে ধীর পায়ে কল্যাণের শয্যাপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো। কল্যাণ বাষ্পাকুল লোচনে তার পানে চেয়ে মৃদু হাসলো। গৌরী কল্যাণের বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে ফিসফিস করে বললে, গৌরী মরে আজ নতুন করে জন্মালো। আমি আনন্দী। আমায় এখন থেকে আনন্দী বলে ডাকবে।

আনন্দী কল্যাণ মিলিত হলো। বাক্য ও অর্থের মতো। ব্যাকরণের সূত্রের মতো। কার্য ও কারণের মতো। সাড়ম্বর উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নয়। গুরুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের আবেষ্টনে নয়। শঙ্খ-ধ্বনির বজ্র ঘোষণায় নয়।

প্রকৃতির আদিম সন্তানের মতো একে অপরের হাত ধরলো। বাহুডোরে দুজনে দুজনের কণ্ঠে মাল্য রচনা করলো। প্রেমের মন্ত্রপাঠ করলো বাণীহীন দৃষ্টির বিদ্যুতে, স্পর্শের উচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের ধ্বনি বিরহিত সঙ্গীতে।

চিরনারী চিরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হলো।

তাদের মিলিত জীবন একটা বিরতি-বিহীন বিস্ময়কর রাগ। অপ্রচলিত হলেও বিচিত্র রাগ এই আনন্দী কল্যাণ। গৌরীর মুখনিসৃত দীপকের মতো।

গৌরীর মেয়ের আগেই কল্যাণ নামকরণ করেছিল নিরালা। ডাকতো নীলা বলে। দুজনের স্নেহমমতায় নিরালা শশিকলার মতো বর্ধিত হতে লাগলো। এই মেয়েটি ছাড়া আর তাদের মিলিত জীবনের দ্বিতীয় কোন অবলম্বন ছিল না। ছিল না কোন দায় দায়িত্ব।

বছরের পর বছর কেটে গেছে।

দুটি নরনারী যখন পরস্পরের চোখে পৃথিবীর চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় তখন তাদের জীবনে বোধ হয় আর কোন ফাঁক থাকে না। দুটি জীবনে যখন সত্যকার প্রেমের আলো জ্বলে ওঠে, তখন বোধ হয় আর অন্ধকারের কোন চেতনাই তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে না।

এরাও প্রেমের আলোয় পথ চিনে চিনে জীবনের নির্ভুল পথে এগিয়ে গেল।

জীবনের উপর দিয়ে দীর্ঘ বাইশ তেইশ বছরের অনর্গল অবিশ্রান্ত বসন্ত বয়ে গেছে। এদের জীবনে ঋতুর আবর্তন নেই। এরা আরণ্যক। এরা আটবিক। এরা পার্বত্য। এরা বন্য। এরা আদিম। এদের মাঝে সংস্কারমুক্ত, বুদ্ধি শাসনের বহির্ভূত এক চিদানন্দ লুকিয়ে আছে যে কোন শাসন মানে না। মানুষের রচিত আইন কানুনকে গ্রাহ্য করে না।

কাহিনী সাঙ্গ হয়েছে।

আনন্দীকে প্রথম দর্শনে রহস্য মনে হয়েছিল। স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই তাকে গোপনচারিনী স্বৈরিণী মনে হয়েছিল। কিন্তু তার বিবৃতি শুনতে শুনতে আমার ধারণা বদলে গেল। আমি মুগ্ধ হলুম। চমৎকৃত হলুম। আনন্দী শুধু প্রিয়দর্শিনী নয় মধুরভাষিনী। বিদ্যুৎ বিদারণের মতো প্রকাশ হতে তার বিলম্ব হলো না। একখানা অপূর্ব ছবি আমার হৃদয়াকাশে চিহ্নিত হয়ে গেল। আমার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতাকে সে চমকে দিল।

আনন্দী আশ্চর্য। আনন্দী দুঃসাহসী। আনন্দী অনন্যা।

আনন্দীর দেহে স্বাস্থ্যের বন্যা। প্রকৃতির শ্যামলতা। পর্বতের শষ্পাবরণের স্নিগ্ধ কোমলতা। বয়স চল্লিশের উর্দ্ধে। তবু তার দেহের যৌবন এখনো উপগত। অপগত নয়। আজো তাদের প্রেম অতন্দ্র।

প্রেম তাদের সমাজ স্বীকৃত নয়। আইন অনুমোদিত নয়। তার জন্যে তাদের মনে কোন খেদ নেই। ক্ষোভ নেই। মনস্তাপ নেই। পাহাড়ের কোলে দীর্ঘ দিন বাস করে বোধ হয় তাদের প্রকৃতি পাহাড়ের মতো আদিম, উদার ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

তারা সত্যকার প্রেমের আস্বাদ পেয়েছে। হলাহল জেনে পান করলেও, পান করেছে মধু। অমৃতের আস্বাদ পেয়েছে।

আনন্দী কল্যাণের স্ত্রী নয়। সামাজিক কোন বন্ধন নেই। বরং অন্তরায় আছে। সে প্রণয়িনী। পুরুষের নারী। তাদের বন্ধন অন্তরের। তাদের বন্ধন হৃদয়ের। হৃৎপিণ্ডের। তাই তাদের আজো

মোহভঙ্গ হয়নি। তাদের প্রেমের দীপ আজো জ্বলছে অনির্বাণ শিখায় উজ্জ্বল হয়ে।

আমাদের বাঙালী ঘরের সাধারণ সধবা মেয়ের সঙ্গে আনন্দীর হয়তো মিল নেই। বিয়ে হতে না হতেই আমাদের দেশের মেয়েরা সহজেই ফুরিয়ে যায়। দেহের মাধুর্যকে নিঃশেষ করে ফেলে বিয়ের মন্ত্রের মহিমায় আর যান্ত্রিক নিয়মের শৃঙ্খলে। আবরণে, আভরণে, চলনে বলনে, কথার সুরে, হাসির ছটায় একটা কৃত্রিমতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। স্বভাবের সবুজ আভাটুকু যায় অকস্মাৎ শরীর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে। তার সর্বাঙ্গে ফুটে ওঠে একটা নির্জীব নিশ্চিন্ততা। তাদের যৌবনের পরমায়ু স্বল্প।

আনন্দী তাদের কাছে অনন্ত যৌবনা অনন্ত রূপসী। পাহাড়ের বুকে রূপালী ঝর্ণার মতো এখনো তার শরীরের তটে যৌবন অব্যাহত। স্বাস্থ্য অফুরন্ত!

কিন্তু তার সত্যকার পরিচয়টা কি?

তার এই তেইশ বছরের জীবনের মাঝেই তো লুকিয়ে আছে তার জীবনের আসল পরিচয়। জীবনের ভুল, ত্রুটি, নীতি-বিগর্হিত অসংখ্য অসঙ্গতির মাঝেই কি তার জীবনের সত্য পরিচয়? না, তার অতীতের চরম ব্যর্থতা, প্রথম জীবনে যা হতে চেয়েছিল তা হতে না পারার ব্যর্থতা তার হৃদয়ের গোপন কোণে পুঞ্জিত হয়ে আছে?

কে জানে?

তাকে দেখে মনে হয় না যে তার মনে কোন ছায়া আছে। যদি বা ছিল কল্যাণের প্রেমের গভীরতায় তা তলিয়ে গেছে। কল্যাণের অবিচলিত প্রেমের নিষ্ঠায়, তার গোমুখ নিঃসৃত ভাবগঙ্গার পূতধারায় মুক্তিস্নান করে নির্মল হয়ে সে কল্যাণের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। মাঝের দুটো বছর জীবনের সমস্ত উপকরণ নিয়ে নিজেকে কল্যাণের

কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে সে দুশ্চর তপস্যা করেছে। সে আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়েছে। উজ্জ্বল হয়েছে।

সে তৃপ্তিতে ঝলমল করছে। অনেক দূর দুর্গম পথ পেরিয়ে সে যেন এই তপস্যার তপোবনে এসে মুক্তির আভাস পেয়েছে। পেয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। বিস্তৃত আশ্রয়। নিগূঢ় সত্য। এই তো মেয়েরা চায়। একটি পুরুষের অবিচল, অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা। এই তো মেয়ে জীবনের সব চেয়ে বড়ো প্রেরণা। এই তো তাদের সুখের চিরন্তন ইতিহাস।

আনন্দী পরিপূর্ণ। তার অভিসার হয়েছে সার্থক। অনেক হারিয়ে অনেক পেয়েছে সে। অনেক কিছু পেছনে ফেলে সামনে তাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। পেছন ভুলেছে সম্মুখ দিগন্তের ডাক শুনে। ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে, শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে বৃহত্তরো বৈচিত্র্যের সন্ধানে। দুঃখ-দুর্যোগ, ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে। পেয়েছে স্বস্তি। পেয়েছে প্রেমের পূর্ণতা। জীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। মিটেছে তাব সকল ক্ষুধা। পেয়েছে একটি প্রেমাসক্ত পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম। আর ঐকান্তিক পূজা। তার প্রেমের মর্যাদা দিয়ে নিজে ধন্য হয়েছে।

তারা সত্যদ্রষ্টা কি সত্যভ্রষ্ট জানিনে। তবে তাদের মিলিত জীবনের সুর আছে। ছন্দ আছে। স্বাচ্ছন্দ্য আছে। স্বাধীনতা আছে। তারা জীবনের একটা ধ্রুব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আত্মার অলৌকিক বন্ধন সাড়ম্বর সামাজিক সকল বন্ধনকে খর্ব করে দেয়। তাদের প্রেম সঙ্কীর্ণতায় পঙ্কিল নয়। জীবন-জিজ্ঞাসায় দুর্গম নয়। তাদের প্রাণচেতনার গর্ভমন্দিরে ধক ধক করে জ্বলছে অনির্বাণ ঘৃত প্রদীপ।

ওদের মিলন তো বিসদৃশ বেমানান নয়। ওদের জীবনের পশ্চাৎ-ভূমি ওদের প্রেমকে একটি সুন্দর রূপ দিয়েছে। ওরা পরিচিত লোকালয় ছেড়ে নির্জনে এসেছে তপস্যা করতে। প্রেমের তপস্যা।

ওদের জীবনের পটভূমিতে একটি লোকোত্তর কবিতার আভাস। নির্জন নিশীথ-শীতল শৈলাবাসে তপোবনের স্নিগ্ধতা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে নিবিড় অন্ধকার থম থম করে তাদের বাঙলোর চারিপাশে আবার শুক্লপক্ষে পাহাড়ের আড়াল থেকে চাঁদ হাসতে হাসতে অরণ্য জটিল পার্বত্য ভূমিতে একটি কল্পমায়া রচনা করে। সন্ধ্যার আকাশ রোমাঞ্চিত করে গাছের মাথায় অসংখ্য বিচিত্র পাখির কল-কাকলী ভেসে ওঠে। বাতাস ফুলের গন্ধে ভরে যায়। আকাশে তারা জ্বলে ওঠে। পাথরের গর্ভ থেকে বেদনার মতো অদৃশ্য অন্ধকার হিমে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে অরণ্যের জটলায় আশ্রয় নেয়। অন্ধকারের আত্মার রহস্যবাণী উচ্চারিত হয় নৈশ বায়ুর স্তব্ধতায়, পাইনের মৃদু মর্মরে। আকাশের নম্র প্রেক্ষণে।

মানুষ কবি হয়ে ওঠে। ভাবুক হয়ে ওঠে। মনে ফুল ফোটে। পুরুষ প্রকৃতিতে মিলে মহাজীবনের মহাকাব্য রচনা করে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রভাবে তাদের জীবন সুন্দর হয়ে উঠেছে। আত্মীয় পরিচিতের নেপথ্যে ও অলক্ষ্যে পালিয়ে না এলে তাদের জীবন সাধনা ব্যাহত হতো। তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠতো। বাঙালীর চলতি সংস্কারের নিষ্পেষণের আঘাতে ও অপমানে দুটি জীবন অকালে ধ্বংস হয়ে যেতো।

আদি সৃষ্টির মূল কথা হলো পুরুষ প্রকৃতির মিলন। দুটি বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে সম্পূর্ণ একটি জীবন। সৃষ্টিলোককে অব্যাহত রাখবার জন্যই এই মিলনের কল্পনা। এই মিলনের সার্থকতা। নরনারীর এই মিলনকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে বেদবিধি, পুরাণ, দর্শন। রচিত হয়েছে কতো সাহিত্য, কতো গাথা। ধর্মের আদি কল্পনা মিলন। সমাজ তার উপর সভ্যতার তেল রঙ মাখালো বিয়ের প্রথা, বিয়ের নীতি, বিয়ের অনুষ্ঠান।

পুরাকালে স্বাধীন-বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগের

লভ-ম্যারেজ বা প্রণয় বিবাহ ও সেকালে অজানা ছিল না। গন্ধর্ব বিবাহকে পৌরাণিক যুগ থেকে হিন্দুরা মান্য করে এসেছে। বিবাহের বাইরের মিলনকেও ছাড়পত্র দিয়েছে। আসলে নরনারীর মিলনের পশ্চাৎভূমিতে যদি প্রেমের মহৎ আদর্শ থাকে, প্রেমের ও কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি তারা মিলিত হয়ে থাকে মিলন তাদের সার্থক।

নইনিতালে ফিরে এসেও তাদের কথা ভাবি। একটা বেদনা-বিজড়িত অপরিসীম আনন্দ নিয়েই ফিরে এসেছি গরম পানি থেকে। প্রণয়ের জন্য প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের অনেক কাহিনী পড়েছি, শুনেছি কিন্তু এই সর্বত্যাগী ক্ষুদ্র সুখি পরিবারটিকে চাক্ষুস করে আমার মনে হলো এতোদিনে এর আসল অর্থ খুঁজে পেলুম। রঙিন একটা কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করলুম।

এদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের পানে চেয়ে কোন দিক থেকেই ওদের নিষ্ফল বা ব্যর্থ মনে হয় না। ওদের দেহে, মনে, বাক্যে, বুদ্ধিতে ও আচরণে দুটিকে অপরূপ সুন্দর ও অত্যন্ত সুখি দম্পতি বলেই মনে হয়েছে। ওদের মাঝে সত্যের আলো না থাকলে ওদের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হতেন না। ওরা এতো সুখি হতে পারতো না। ওদের শান্ত দীপালোকিত গৃহকোণের স্নিগ্ধ মাধুর্য আমার মনকে এমন করে টানতো না। আনন্দী যাই হোক সে তো আমাদের অপরিচিত নয়। সে আমাদের ঘরের মেয়ে। চিরপরিচিত। চিরসুন্দর।

ভাবছিলুম তাদেরি কথা। চমকে উঠলুম পরিচিত কণ্ঠস্বরে।

পাশের কামরার ছেলে জোসেফ বলছে, ইয়েস, হিয়ার ইজ্ রুম নাম্বার ইলেভেন।

—কল্যাণ? কাম ইন্।

পর্দা ঠেলে হাস্যমুখে কল্যাণ এসে আমার ঘরে ঢুকলো।

—ব্যাপার কী ? আয়। আয়

—তোকে দেখতে এলুম। আপিসের ছুটি তাই সকলে মিলে বেড়াতে এলুম।

—সকলে ? আনন্দী নিরালাও এসেছে নাকি ? কোথায় তারা ?

—তাদের আর হোটেলে আনলুম না। তারা মল্লিতাল বাজারে আছে।

আমি ভাবলুম হয়তো বা তাদের কোন দোকানে বসিয়ে রেখে এসেছে। বিরক্ত হয়ে বললুম, সে আবার কি ? তাদের আনলি না কেন ?

কল্যাণ হাসলো: তোর দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। তাদের পথে বসিয়ে রেখে আসিনি। বাজারে একটা আমাদের আস্তানা আছে। বিশেষ বন্ধুলোক। সেইখানে উঠেছি।

আমি আশ্বস্ত হলুম।

কল্যাণ জিজ্ঞেস করলে, কই, প্রণব বাবাজীকে দেখছি না যে ?

আমি বললুম, সে পাশের গুজরাতিদের সঙ্গে চীনা পিক্, লড়িয়া কাঁটা দেখতে গেছে।

—ঘোড়া নিয়ে গেছে তো ?

—সম্ভব। ওদের ছেলে মেয়েরা আছে।

ম্যানেজারের আপিসে ঘরের চাবিটা রেখে আমি কল্যাণের সঙ্গে বেরুলুম।

ম্যাল পার হয়ে উপরে উঠে মল্লিতাল বাজার। নইনিতাল ছোট শহর। লেকটিকে ঘিরেই এর যা কিছু সমৃদ্ধি। আর সব শৈল শহরের মতোই ম্যালটি চমৎকার সাজানো। লেকের ধারে গ্যালারীর মতো দোতালা রাস্তা। রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো সুসজ্জিত দোকান-পাট। লেকের দুদিকে দু'টি বাজার। তল্লিতাল আর মল্লিতাল। তল্লিতালে পোষ্টঅফিস আর বাসস্টাণ্ড।

কল্যাণের সঙ্গে আমি বাজারের একটা সুসজ্জিত দোকানে গিয়ে

উঠলুম। বেশ বড়ো প্রভিশন ও ষ্টোরস্‌-এর দোকান। জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, লজেন্স, পাউরুটি, হ্যাম, বেকন, সসেজ, ছাতা, ছড়ি, বই হরেক রকমের পশারী। এদের বিশেষত্ব হলো এরা এখানকার সব চেয়ে বড়ো মধু বিক্রেতা। উত্তর প্রদেশের বনবিভাগের সংগ্রাহক ও বিক্রেতা।

নিচে দোকান। উপরে দোকানের মালিক মিষ্টার রাও-এর আবাস।

দোকানের কাউন্টারে বসেছিল স্যুট পরিহিত একটি সুদর্শন তরুণ। কল্যাণের সঙ্গে আমাকে দোকানে ঢুকতে দেখে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো এবং আমাকে অভিবাদন জানালো।

কল্যাণ আমার মুখপানে চেয়ে মৃদু হেসে তরুণের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল: সুচাঁদ রাও। দোকানের সত্বাধিকারীর একমাত্র পুত্র।

তরুণ আনত ভঙ্গিতে বললে, ভেতরে চলুন, আমি আসছি।

ভিতরে গিয়ে দেখা হলো আনন্দী আর নিরালার সঙ্গে।

ঘরে ঢুকতেই হাসি মুখে আনন্দী বললে, দেখলেন দাদা ছেলেটিকে?

—হ্যাঁ! কেন?

আমি প্রশ্নভরা উৎসুক চোখে তার পানে চাইলুম।

আনন্দী বললে, ঐ সুচাঁদ ছেলেটি আমাদের জামাই হবে।

—তাই নাকি? কল্যাণ স্টুপিডটা তো কিছু বললে না।

কল্যাণ হাসলো।

আনন্দী জিজ্ঞেস করলে, ভালো হবে না?

—চমৎকার হবে।

কল্যাণ বললে, ছেলেটি বি, এস-সি পাশ করেছে। বাপের ব্যবসা দেখাশুনো করছে। অবস্থা ভালো। বিয়ে হয়ে গেলে নীলাকে নিয়ে সুইটজারল্যাণ্ড যাবে ওর চোখের চিকিৎসা করাতে।

মুখ ফিরিয়ে দেখি সুচাঁদ এসে নিরালার পাশে দাঁড়িয়েছে

আমি তাদের পানে চাইতেই তারা দুটিতে হাত ধরাধরি করে আনত ভঙ্গিতে আমায় প্রণাম করলে।

আমি উচ্ছ্বসিত আবেগে বুকের দুপাশে দুজনকে টেনে নিয়ে তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলুম।

সুচাঁদ আর্দ্রকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বললে, আশীর্বাদ করুন যেন নীলার চোখ ভালো করে নিয়ে আসতে পারি।

আমার চোখদুটি বাষ্পাকুল হয়ে উঠলো। একটা অনির্বচনীয় পুলকে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাদের মাথাদুটি বুকের মাঝে চেপে ধরলুম।

আনন্দী এক সময় আমায় হাসতে হাসতে বললে, এ-ও দাদা সেই রসিক দেবতার লীলা, যিনি অন্ধকারে আমাদের বুকে আলো জ্বেলে ছিলেন। ছেলেটি আসতো ফরেষ্ট আপিসে মধু সংগ্রহ করতে। নীলাকে দেখে বছর দুই আগে। দৃষ্টিহীন অন্ধ নীলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। মুখের আলাপ দুজনের মনে গিয়ে বাসা বাঁধলো। ছেলেটিই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো। বাপ-মায়ের সম্মতি আদায় করলো। আলমোরার এক সাহেব আই-স্পেশালিষ্ট এর কাছে নীলাকে নিয়ে গেল। তিনিই বলেছেন, সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে চোখ অপারেশন করালে অবধারিত সেরে যাবে। ওর বাবা রাজি হয়েছে বিয়ে দিয়ে ছেলে-বউকে সুইজারল্যাণ্ড পাঠিয়ে দিতে। বুড়োরও নীলাকে ভারি পছন্দ।

কল্যাণ কৌতুক করে বলে, প্রেমের ঠাকুরের উপর আনন্দীর অগাধ বিশ্বাস।

আনন্দী মুখ লাল করে কটাক্ষ হেনে বলে, তা না হলে গায়ে কাদা-মাটি মেখে তোমার তপস্যার তপোলোকে পৌঁছতে পারতুম না। আমার বিশ্বাস আর তাঁর করুণা। নইলে ওই কানা মেয়ের এতো সহজে এমন সৎপাত্রে বিয়ে হয় নাকি?

তা ঠিক। সেই দেবতারই কৃপা যিনি সব দেবতার চেয়ে শক্তিমান। সব দেবতাদের উপর যাঁর আধিপত্য অবিরোধ। যাঁর পুষ্পধনুর দৌরাত্ম্যে দেবতারা তটস্থ। প্রতিপত্তি যাঁর ত্রিলোকবিদিত।

আনন্দী বললে, নিরালার বিয়েতে কিন্তু তোমার আসা চাই দাদা। তুমি এসে আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে আমরা বাঙালী। সব অস্বীকার করেছি, সব ভুলেছি। শুধু ভুলতে চাইনা যে আমরা বাঙালী।

তার গলার স্বরটা মমতায় কোমল হয়ে এলো। কালো চোখের দীর্ঘপল্লব গুলো কেঁপে উঠলো।

সিলভারটন হোটেল,
নইনিতাল।
মে, ১৯৬০।